ছোটগল্প

সূচি

নগ্ন পা ৪৯৩
হালুম ৪৯৭
ফিডিং বটল ৫০১
বাবা ফেকু ৫০৫
ন্যাংটার দেশে ৫১০
খড়ম ৫১৬
শবেবরাত ৫২১
একটি তালাকের কাহিনী ৫৩০
মানুষের জন্য ৫৩৫

নগ্ন পা

পাড়ার যুবক ছেলেবা একবার রাহেলার দিকে চোখ তুলে চাইল, তারপর আনোয়ারা, রওশনারা, জুলেখার পানে চোখ নামালো। সবার শেষে আবার আঁখি-ভরা কৌতূহল নিয়ে চোখ তুললো রাহেলাব দিকে— আর দৃষ্টিশক্তির সব ক্ষীণ রশ্মিগুলো স্থির হয়ে রইল সেই এক বিন্দুতেই।

চৌধুরীদের নতুন বৌ রাহেলা। দুদিন হয়নি এ পাড়ায় এসেছে কিন্তু এরি মধ্যে বান্ধবীর ওর অভাব নেই। ওর অনুকরণে শাড়ি পরতে, পূর্ণ রঙের লিপস্টিক্ ঘষতে যুবতী মহলে লেগে গেছে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব। রাহেলা ঘুরছে এদের ভিড়ের মাঝে জ্বলন্ত একটা নক্ষত্রের মতো। রক্তবর্ণ ক্রেপ-ডি-সিন শাড়িটা যখন-তখন ঘূর্ণী দিয়ে ফুলের ফোয়ারা তুলে আগুনের ফুলকির মতো কথা বলে চলেছে সবার সাথে। যখন-তখন ভেঙে পড়ছে রসিকতার উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে। ওর চারধার আঁধার করে কোনও নতুন-বৌ-আবহাওয়া যেন সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন শাশুড়ীর কঠোরতাও যেন ভেঙে ফেলেছে অনেক আগেই।

নতুন বৌব বেহায়াপনার প্রতি কটাক্ষ করে দাদী খালাম্মাদের কেউ কেউ মাথা নাড়তে লাগলেন। মৃদু সুবে নিচু আঘাতে দুচাবটা মতামতও প্রকাশ করলেন। স্নেহমাখা সুরে শাশুড়ি শুধু বললেন, 'বৌর আমার কচি বয়স, তাই। দুদিন যাক, দেখো জ্ঞান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পাশের ঘবে বাহেলাব শ্বশুর মসুদ হুসেন সাহেব গুড়গুড়িতে টান দিলেন আবেকটু জোরে। নিজের যুবক বয়সটাকে চোখ বন্ধ করে জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করলেন একবার। না পেরে, ক্লান্ত হযে চোখ দুটো আর খুলতে চাইলেন না। আধ-ঘুমো হয়ে গুড়গুড়িতে আবার মৃদু টান দিলেন, তারপব স্বল্প কাৎ হয়ে ইজি চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ইউসুফ সাহেবি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। পাতলা রোগা ছিপছিপে দেহের গড়ন। যতটুকু দেখে তার চেয়ে বেশি বোঝে। যতটুকু বোঝে তাব চেয়ে বেশি বলে। আর যতটুকু বলে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে। এককথায় ও ওর সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, চপলগতি বড় বোন বওশনাবাব সংক্ষিপ্ত পুরুষ সংস্করণ।

সেদিন বিকেল বেলা ক্রিকেট মাঠে খেলা দেখতে দেখতে ওর মনেব মাঝে হঠাৎ চমকে উঠল রাহেলার দেহ-ছন্দ। খেলার মাঠে আসবার পথে আপাকে রাহেলাদের বাড়িতে ছেড়ে আসবার সময় অল্প কয়েক মিনিটের উদাস দেখা স্মৃতিচিহ্নটা হঠাৎ লাল ক্রিকেট বলটার সাথে তীব্র গতিতে জ্বলে উঠল ওর মাথায়। বড় আপার রূপটাই এতদিন ওর শিল্পীমনের বেদীতে নিখুঁত রূপকল্পনার দেবী হয়ে পুজো পাচ্ছিল নিঃশব্দে। হঠাৎ ওর মনের মাঝের পারদভবা পাথর-বাটিটা যেন ভেঙে চূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল সবুজ মাঠে।

দুদিন পর। রওশনারাকে স্বীকার কবতেই হলো যে ইউসুফের কথায মোহ আছে। ও জানে সংলাপের মাঝে কোথায এসে গলাটা কবে তুলতে হবে সদ্য-ঘুম-ভাঙা, কোথায় স্বব নিচু করে

থাক্ দিতে হবে ঘন-ঘন। মেয়ে হয়েও রওশনারা হার মানলো ছোট ভাইর কাছে। বুঝল যে নিজের শ্রদ্ধার আসনটা ইউসুফের মনে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে অনেকখানি। আর এ-ও বুঝল যে রাহেলার সাথে ইউসুফ যখন কথা বলছে সাহিত্য কি সিনেমা নিয়ে সেখানে রওশনাবার কোনও বিশেষ প্রয়োজন নেই, প্রাণ নেই। ইউসুফের ভাবি ডাকে রাহেলা যে ম্যাডোনা হয়ে ওঠে!

রাহেলা আর রওশনারা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লুডো খেলছিল। রওশনারাই যেন খেলছিল বেশি। রাহেলার আগ্রহ ততটা আছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে তাই ক্ষীণ অনিচ্ছার চিহ্ন নিয়ে বাঁ পা-টা বিছানার ওপর উঠছিল আর পড়ছিল। ফেনপুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে শাড়ির গোছা জমে উঠছিল সুগঠিত পায়ের গোছার নিচে। ঘরের কোণায় ইউসুফ রাহেলার এ্যালবামটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে রাহেলার দিকে চাইল। ওর ইচ্ছে হয়েছিল ভাবিকে কিছু বলে একটা বিশেষ ছবি সম্বন্ধে। আচমকা ও কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল। ঘরের অন্য কোণে সিলাইরত রাহেলার শাশুড়ীকে ও ভুলে গেল। একদৃষ্টিতে ও চেয়ে রইল ওর শূন্যতে। মনের মাঝে মুহূর্তের জন্য ডি'মেলোর নগ্ন পায়ের গোছাটা পেডাস্টালচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ল অসীম অন্ধকাবে।

'ইউসুফ, ইউসুফ', অট্টহাসির সাথে রাহেলা চিৎকার করে উঠল, 'বলি, আমাব পা-টাকে কি খেয়ে ফেলবি নাকি! বাবারে। বাবারে! জুতোর দোকানের অসভ্য দোকানীটাও অমন করে চোখ দিয়ে গিলে খায় না।' হাসির ভাঙনে টুকরো হয়ে রাহেলা উঠে দাঁড়াল। রাহেলাব রসিকতাটা কেমন যেন বিশ্রী মনে হলো। আম্মাজান বোধ হয়ে শুনেও শুনল না। ইউসুফের রুগ্ন দেহের ফিকে রক্ত তবু যেন একবার ঝলসে উঠল সমস্ত মুখে। স্ববচা পৃথিবী থেকে আচমকা ফিরতে গিয়ে ও লাল হয়ে উঠল অকারণে।

সন্ধ্যার সময় ইউসুফ সিঁড়িব গোড়ায় এসে ডাক দিল— 'ভাবি'।

প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যায়নি তখন; রাহেলা মভ্ রঙের শাড়িটা সাপেব মতো তনুময় পেঁচিয়ে দেখা দিল সিঁড়ির গোড়ায়। একঝলক আলোব তরঙ্গের মতো পিছলে নেবে পড়ল সিঁড়ি-পথে। তারপর সেখান থেকেই চিৎকাব করে আম্মাজানকে জানিয়ে দি·, সে আজ সিনেমায় যাচ্ছে আর তাই বেবি অস্টিন গাড়িটা থাকবে তারই হুকুমে, সিনেমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অল্প আলোতে সন্ধ্যা দেবীকে ইউসুফের চোখে ঠেকল বড়বেশি স্থির; তবে আত্মাটা যেন গতির প্রতীক। সেলফ স্টার্টারে টান দিয়ে রাহেলা একবার জিজ্ঞেস করল, 'কোন পথে'?

তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই স্পিড বাড়িয়ে দিল রমনার দক্ষিণ কোণে। বিদেশী ছবির রাজপ্রাসাদ পানে।

বোধহয় এক ঘণ্টাও হয়নি। হুডবিহীন লাল বেবি অস্টিনটা হঠাৎ কর্কশ একটা শব্দ করে আবার চলতে আরম্ভ করল রাহেলাদের বাড়ির দিকে। তৃতীয় গিয়ারে উঠেই রাহেলা চাপা গলায় বলে উঠল : 'ছি, ছি, না না, ক্ষমা তোমায় আমি করব না। আর তোমার সাথে সিনেমা দেখাও আমার এই শেষ।—'

'ভাবি—'

'চুপ কর। কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে। সত্যি এতটা তোমায় আমি কোনোকালেই ভাবতে পারিনি।'

গাড়ির গতিটা আরেকটু কমিয়ে রাহেলা চুপ করে রইল। একটা অকথ্য বিশ্রী বেদনায়

ইউসুফের সমস্ত দেহ কুঁচকে এল। ছন্নছাড়া ব্যথায় চোখ দুটো ওর ভরে এল তপ্ত অশ্রুতে। ক্ষমাহীন অত্যাচারে সিক্ত চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল রাস্তার মৃদু আলোকে। ধীরে রাহেলা ওর বুকের ভাঁজ থেকে উগ্র সেন্ট-মাখা ক্ষুদ্র উষ্ণ রুমালটা ওর চোখে চেপে দিল। স্টিয়ারিংটা শক্ত করে ধরে হিম নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাহেলা চেয়ে রইল সম্মুখ দূরত্বের পানে।

সমদূরে দাঁড়ানো ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক আলোতে বেবি অস্টিনের ছায়া কখনও লম্বা হয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে উঠল। কখনও পেছনে কখনও সামনে।

গাড়ি থেকে নামতেই রাহেলা আবার চক্‌মকিয়ে উঠল ওর পুরোনো উচ্ছ্বাসে। হৈচৈ করে ইউসুফকে টেনে নিয়ে উপরে উঠে গেল। আম্মাজান একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী, তোদের আজ হলো কী ? এত শিগ্‌গির চলে এলি যে!'

'বিশ্রী ছবি আম্মাজান বুঝলেন, তাই চলে এলাম। আর দেখুন আমাদের ইউসুফ সাহেব আবার চটে আছেন ভীষণ। ওনাকে আমার নিজ হাতে কিছু না খাওয়ালে কিছুতেই আর ওর রাগ ভাঙানো যাবে না।'

রাহেলার স্বামী মাহমুদ সাহেব তখন ঘরে ফিরেছেন। সবাই মিলে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল। জোর করে রাহেলা ওর নিজের হাতে ইউসুফকে খাওয়াল। ইউসুফের তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, বুঝিবা সব একটা নিছক ব্যঙ্গ-অভিনয়। রাত সাড়ে নটার সময় অযথা-আদরে উথ্‌লে ওঠা পরিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরল, ওর মন তখন আবার ফিরে এসেছে নিজের রচা স্বপ্নরাজ্যে।

রাত্রি বেলা শোবার সময় অন্ধকার ঘরে ড্রেসিং গাউনটা ভাল কবে সমস্ত দেহে জড়িয়ে ধরে যন্ত্রচালিতের মতো রাহেলা চুলের ভেতর চিরুনি চালিয়ে যাচ্ছিল। ওর লম্বা কালো কোঁকড়া চুল। হাল্‌কা মনটা গুঁড়ো কাঁচের ওপর ইঁদুরের পদধ্বনির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল উদ্দেশ্যহীন নিঃশব্দে। ওর স্বামী মাহমুদ বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানছিল নিবিষ্ট মনে। হঠাৎ ডাকল, 'রাহেলা।'

'কী ?— বল।'

'ইউসুফ এখানে রোজ কেন আসে ?'

'অর্থ ? ও কথা ওকে জিজ্ঞেস করলেই পার।'

রাহেল হঠাৎ বিষিয়ে ফুলে উঠল। ঘন আঁধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাহমুদ সুকটু জোর গলায় বলে উঠল, 'আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি।'

'কেন ? আমি কি ওকে আসতে বলেছি ?'

'কাল থেকে তুমি তাহলে তাকে আসতে নিষেধ করবে।'

'মানে, তুমি কী বলতে চাও ?—'

'কাল থেকে ও এখানে আসবে না— ব্যাস এই।'

আঁধারে একটা চাপা হাসির বিকৃত মুখ সংকোচনে রাহেলার সমস্ত দেহটা একবার দুলে উঠল। আলাদা বিছানায় শুতে শুতে ওর সমস্ত মাংসপেশীগুলো শিউরে উঠল সব পুরোনো কল্পনা আর আদর্শের অত্যাচারে।

হঠাৎ মনের ভেতরকার উচ্ছ্বাসটা থমকে দাঁড়াল একটা আরো বড় সুন্দর কঠোর মন-নির্দেশে।

কয়েক ফার্লং দূরে ইউসুফ নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠল। ওর মাথার কোষে

তখন অজস্র আঙুল বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে, স্থিতিহীন অসংখ্য আকার ভাঙছে, গড়ছে। চোগতাই-আঁকা— মোগল শিল্পী-রচা নিখুঁত আঙুলগুলো রেণু রেণু হয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল মনের আদর্শ-বিন্দু থেকে। ওর শিল্পীমনটা একবার চিৎকার করে উঠল, 'না-না এ অসম্ভব। খোদা-সৃষ্ট দেহ এসে ধ্বংস করবে ওর রুচির আদর্শ'। তবু ওর হার হলো। স্পর্শ পাওয়ার অদম্য উন্মাদনায় ও পাগলা হয়ে উঠল। পকেট থেকে অশ্রু-ভেজা গন্ধমাখা ছোট্ট রুমালটা ও চেপে ধরল ওর সমস্ত মুখে, ঠোঁটে। স্পর্শ করেছিল রাহেলার ঐ বিচিত্র আঙুল, ওকে খাওয়াবার জন্যে ঘণ্টা দুই আগে।

ভাল করে বেলা না হতেই একটা অর্থহীন কারণ খুঁজে নিয়ে ও রাহেলাদের বাড়িতে এল। 'ভাবি' বলে একটা ডাক দিয়ে রাহেলার পড়ার ঘরে ঢুকল। রাহেলা তখন হাতের বিদেশী নভেলটা ছেড়ে, মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ইউসুফ হেসে উঠল। তারপর ধীরে রাহেলার টেবিলের ওপর বিছানো আঙুলগুলোকে মৃদু স্পর্শ করে ও সবে একটা প্রশ্ন করতে যাবে,— তড়িৎ গতিতে হাতটা সরিয়ে নিয়ে রাহেলা গম্ভীর সুরে উচ্চারণ করল— 'ইউসুফ!—' ইউসুফ চমকে উঠল। ভয়ার্ত চোখে ও বলতে গেল।

'ভাবি— এ—'

'ইউসুফ কাল থেকে তুমি এ বাড়িতে এস না।'

'ভাবি, কী বলছ ? কেনই বা আসব না ?'

'কাল থেকে আমিই যাব। তোমার কাছে!' অস্ফুট কণ্ঠে রাহেলা শুধু উচ্চারণ করল।

সর্পিল লেকের কোণে সন্ধ্যায় ঘনান্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো দুটো মানুষ বসেছিল পাশাপাশি। ছেলেটার অনভিজ্ঞ ভীরু মন তখনও কাঁপছিল আধ-আলো আধ-অন্ধকারে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সাথে। নিঃশব্দে ইউসুফ রাহেলাকে স্পর্শ করল। রাহেলা স্বপ্ন ভরা সুরে শুধু বলল, 'ইউসুফ আমায় তুমি অন্ধ করেছ'।

খুট করে দরজা খুলে রাহেলা হল ঘরে ঢুকল। আম্মাজান ও ঘরেই বসেছিলেন। রাহেলার বাইরে যাওয়ার পোশাক দেখে মনে মনে হাসলেন। ব্যবহারের নম্রতা দেখে খুশী হয়ে উঠলেন খুব। রাহেলার দেহ ঘিরে কালো একটা বোরখা জড়ানো। শুধু মুখের পাতলা কাপড়টা স্বল্প উঠানো।

বোরখা ছাড়া রাহেলা এখন আর কোথাও বেরোয় না। অযথা অসভ্য রসিকতার অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে না।

আম্মাজান গর্বে হেসে উঠে নীরবে বললেন, বলেছিলাম না— 'আরেকটু জ্ঞান হোক, তখন দেখো।'

আব্বাজান গুড়গুড়ি টানতে টানতে আরেকটা কিছু অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফলকাম হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার ইজি চেয়ারে। কাৎ হয়ে।

পাড়ার যুবক ছেলেরা চোখ তুলে রাহেলার দিকে আরেকবার চাইল, তারপর রওশনারা, আনোয়ারা, জুলেখার পানে। সবার শেষে আবার চোখ উঠাল রাহেলার পানে— আর সেখানেই স্থির হয়ে রইল সবগুলো চমকানো-ব্যাগ্র আঁখি।

হালুম

আশরাফ মুনশির এক চোখ কানা। কালো, বলিষ্ঠ জোয়ান দেহ। সমস্ত মুখে গুটি বসন্তের ছোট ছোট গর্ত। বুদ্ধির দীপ্তিতে ভালো চোখটা সব সময়েই জ্বলছে। আশরাফ মুনশিকে ভয় করে না চৌধুরী বাড়িতে এমন কেউ নেই। বাড়ির বৌ ঝিরা আড়ালে আবডালে আশরাফ মুনশিকে ডাকে 'হালুম' বলে। অর্থাৎ শুধু বাঘ নয়; এ একেবারে বাঘের নির্দয় আক্রমণ।

কাছারি ঘর থেকে আশরাফ মুনশির গলা খাকর শোনা গেল। অমনি বিশ্রামরতা মুনশির তিন ছেলের তিন বৌ অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে কঠিন কর্মব্যস্ততায় ছিট্‌কে পড়ল উঠানময়। তক্‌তকে উঠান ছোট বৌর ঝাটাব নিতান্ত অনাবশ্যক স্পর্শে দ্বিতীয়বার মুখরিত হয়ে ওঠে। কোলের শিশুকে দড়াম করে মাটিতে শুইয়ে স্থূলকায়া মেজ বৌ শীর্ণমুখী পিপের মধ্যে অর্ধেক শবীর গলিয়ে দিল মরিচ বার কবতে। সুন্দরী বড় বৌ শুধু নিষ্কম্প পায়ে উঠে এল শোলার বেড়া অবধি; ফাঁক দিয়ে হরিণ চোখে একবার দূরত্ব টুকুন আন্দাজ করল, তারপর মুখের কম্পিত ঘর্ম্মবিন্দু মুছতে মুছতে শুকাতে দেয়া কাওন ধানগুলো আরো ভালো করে বিছিয়ে দিতে শুরু করে দেয়। এমনকি ওদের শাশুড়ি জাহেদা বিবি পর্যন্ত উত্তেজনায় উনুনের মধ্যে এক সাথেই পুরে দিল এক গাদা লাক্‌ড়ি।

উঠানে আশরাফ মুনশি প্রবেশ করলেন। পেছন পেছন এল পশ্চিম বাড়িব মকিম কাকা। মুনশি এক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। তীব্র সন্ধানী আলোর মতো সে চোখ যেন সমস্ত উঠান তন্ন তন্ন করে দেখল কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। কোথাও কেও আকামা বসে আছে কিনা। আশরাফ মুনশি সব পারে কিন্তু ঐ কুঁড়েমি বরদাস্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই বাড়ির ভাত গিলতে হলে কাজ করতে হবে। শুধু কাজ আর কাজ। মুনশি তাহলেই খুশি। কিন্তু কাজের এত নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আশরাফ মুনশি খুশি হলো কিনা বোঝা গেল না। কোনো দিনই সেটা বোঝা যায় না। আশরাফ মুনশির সে তীব্র চোখ যেমন একক, তেমনি অভিব্যক্তিহীন, পরিবর্তনহীন। মকিম কাকাকে ঘরের দাওয়ায় বসতে বলে মুনশি গরু নিয়ে গোয়ালে ঢোকে। সেখানে থেকেই বড় বৌকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দেয়— জৈল্যা কৈরে ? জৈল্যা মুনশির বড় ছেলে, বড় বৌর স্বামী। বড় বৌ একটু এগিয়ে এসে, মাথার কাপড় ভালো করে টেনে, অত্যন্ত আদপের সঙ্গে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলল— হ্যাতেনত ধান নিরাইতো হাঁতেরো গেছে আব্বাজান!

ধান নিরানো দূরে থাক জলিল মানে জৈল্যা তখন ক্ষেতের আশেপাশেও কোথাও নেই। বৌর হাত বারা ভাত খেয়ে সে তখন গোলার ঘরে ঘুমাচ্ছে। বড় বৌর এই স্বার্থপর, নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ঈর্ষান্বিত হয়ে ছোট এবং মেজ উভয়েই আঁচলের আড়ালে ভেংচি কেটে উঠল।

মুনশি আবার গর্জে উঠল— হেতীরে ক্যানা ভাত লই আইতো। হেতী মানে সে অর্থাৎ আশরাফ মুনশির স্ত্রী, ওরফে জাহেদা বিবি, তখন মাটির বাসনে ভাত আর কলাপাতার পোড়া ছোট মাছ সাজিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে।

খেতে খেতে আশরাফ মুনশি মকিম কাকাকে আগামী মোকদ্দমার সব মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছিল। মোকদ্দমা করা মুনশির এক অদ্ভুত নেশা। আশে পাশের দু'চার গ্রামে এ ব্যাপারে মুনশির বেশ নাম ডাক আছে। দলিল ওলটপালট করা থেকে মিথ্যে সাক্ষী মর্মস্পর্শী করে দাঁড় করাতে মুনশির জুড়ি এ তল্লাটে আর নেই। হাতের লোকমা মুখে তুলে মুনশি মকিমের সাক্ষীর শেষ মহড়া শুনবার জন্য পরীক্ষকের সুরে প্রশ্ন করে— এইবার ক্যাছেন কী করি ? গড় গড় করে মকিম তার মুখস্ত সাক্ষী এক নিঃশ্বাসে আউড়ে যায়। কিন্তু শেষ না হতেই মুনশি প্রচণ্ড গর্জনে ধমকে ওঠে, কী কিইলি ? আমতা আমতা করে ঢোক গিলে মকিম আবার বলে, অ্যাঁ কঁইয়ুম আঁই টাকা লইন্য। মুনশি ফেটে পড়ল— আরামজাদ টাকা' ন্য, 'ট্যায়া' 'ট্যায়া' তুই মুজুর মান্দারের জাত, তোর মুখে টাকা হুইনলে হাকিম, হাকিম বুঝি ফালাইব যে কেউ হিঁয়াই দিছে। তুই কবি ট্যাঁয়া, ট্যায়া! বুইঝত নি ? মকিম থতমত খেয়ে ভয়ে কয়েকবার টাকার প্রতিশব্দ নিজ ভাষায় মুখস্ত করতে শুরু করে— ট্যাঁয়া, ট্যায়া, ট্যায়া' টাকা'-ট্যায়া! ট্যায়া!

মশ ষ্ ষ্ ষ্ ঝুপ !

শব্দ শুনেই তিনটি বৌ চমকে ওঠে। এ ওর দিকে তাকায়। চোখে মুখের ভাষায় এ ওকে জানায় যে পাতাটা পড়েছে দক্ষিণের বাগানে।

শব্দটা আর কিছুরই নয়, শুকনো নারকেলের পাতা ডগা বাতাসে ভেঙে নিচে পড়েছে তারই। গ্রামের ভাষায় বলে 'বাক্সা পাতা'। চার পাঁচ হাত লম্বা পুরু ডাঁটের ঐ পাতায় চমৎকাব জ্বালানি কাঠের কাজ চলে। জ্বলে ভালো, ধুঁয়োও কম হয়। খোদার বাতাসে ধাক্কা লেগে সে পাতা মাটিতে পড়েছে। তাই যে আগে ছুটে গিয়ে সেটা তুলতে পারে সেই হয় তার মালিক। এই হলো ঘরোয়া বিধান।

পা টিপে তিনটি বৌ শ্বশুরের জ্বলন্ত চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে ছাঁট দেয়াল ঘেঁষে এগুতে থাকে। দৃষ্টি সীমানার বাইরে এসেই নির্লজ্জ বেগে ছুটতে আরম্ভ করে তিনটি বৌ। বর্তুলাকার মেজ বৌ মাঝ পথেই একবার হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ছোট বৌ মরিবাঁচি করে দৌড়ের ঝোঁকের মধ্যেই লম্বা করে হাতটা বাড়িয়ে দিল পাতাটাকে ধরবার জন্য। এমন সময় কোত্থেকে সুড়োল পায়ে ভর করে বিদ্যুৎ বেগে বড় বৌ এসে দাঁড়াল একেবারে পাতাটার গা ঘেঁসে। এবং ব্যথিত ছোট বৌর ক্লান্ত কম্পিত আঙুলের একেবারে স্পর্শ সীমানার মধ্য থেকেই বড় বৌ সড়াৎ করে সরিয়ে নিল পাতাটা। কালো ঘন দীর্ঘ উড়ন্ত চুলের মাঝখানে, বড় বৌর অরক্তিম মুখে সে কী উদ্ভাসিত হাসি! সেখানে নেই বিন্দুমাত্র সহানুভূতির আর্দ্রতা। চক্‌চক্ করছে শুধু একটা আলোকোজ্জ্বল নির্মম বিজয়োল্লাস।

সবাই এক পরিবারের। তাই একজন পাতার একচ্ছত্র অধিকারিণী হওয়াতে ব্যক্তিগতভাবে কারোই এমন কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। তবু পরাজয়ের এ গ্লানি অন্য দু' বৌর মুখে এঁকে দিল গভীর সুস্পষ্ট ছাপ।

আশরাফ মুনশি বাড়ি নেই। শহরে গেছে মোকদ্দমা চালাতে। সমস্ত বাড়ি জুড়ে শান্তি আর আলসেমি যেন হাই তুলছে। উঠানের গরুগুলো পর্যন্ত গলার ঘণ্টা নেড়ে মাথা ঘুরিয়ে শুয়ে আছে। মুখের জঙ্গল মুখে তুলতে আজ আর ওদের একটুও গরজ নেই। আশরাফ মুনশি আজ বাড়িতে ছিল না, তাই কেউ আজ আর বুদ্ধি করে গরুগুলোকে প্রথমে মুগের গাছ খাইয়ে তারপর ঘাস দেয়নি। তাই ওরাও আজ নবাব হয়ে উঠছে। মানুষের মতো গরুও খুব ক্ষিদের

সময় যা সামনে পেত তাই চিবাত। এমনি করে মুগের জঙ্গল তৃপ্তির সঙ্গে খেত। কিন্তু এখন ওরা জঙ্গল কিছুতেই মুখে তুলবে না। এই নরম কচি ঠাণ্ডা ঘাস; তুল্‌তুলে, সবুজ।

ঘরের দাওয়ায় বসে ছোট বৌ, মেজ বৌর ছেলেকে চুম দিয়ে কাঁদাচ্ছে। মেজ বৌ বড় বৌ একরাশ বেসামাল কালোচুল কোলে নিয়ে ঘেমে উঠছে; উঁকুন বাছতে গিয়ে নিজের চোখমুখ হারিয়ে ফেলছে ঐ কালো ঘন চিকন আকাশে। মুগ্ধ হয়ে শুধু উচ্চারণ করে— বড় বিবি তোর চুল কী সোন্দর!

আহ ছিড়ি হালাইবি নাকি ? চুলে টান পড়াতে চিৎকার করে ওঠে বড় বৌ। মেজ বড়োর মাথায় একটা হোটা দিয়ে বলল, ছিড়তাম ন্য এত সোন্দর ক্যা তোর চুল ?

মশষ পর ঝুপ ?

কোথায় শিশু কোথায় চুল তিনটি বৌ একসাথে দাঁড়িয়ে পড়ে চোখের পলকে। ছোট বৌ এই ক্ষণিক অবসরের মধ্যে শুধু একবার, হিষ হিষ করে ওঠে— দেইখ্যুম বড় বিবি তুই হাঁস্ ক্যামনে এইবার ? বলেই ছুট। কানের হিসাব খুব ভুল হয়নি। অন্দরের ঘাটে দাঁড়িয়ে তিনো বৌ দেখল পাতাটা পড়েছে পুকুরের উল্টো পাড়ের মাঝামাঝি। তাও ডাংগায় নয়, পড়েছে পানিতে। বিরাট পুকুর। ডান পাড় দিয়ে ঘুরে ছুটলে বেশি ভালো হবে না, বাঁ পাড় দিয়ে গেলে আগে পৌছানো যাবে— মেজ আর ছোট কেউ তা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। বড় বৌ স্থির গভীর চোখ মেলে ভাসমান পাতাটাকে শুধু দেখছে। আচম্‌কা ছুটল ছোট বৌ দক্ষিণ পাড় ধরে, মেজ অমনি নিল উত্তরের পথ। মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রইল বড় বৌ, স্থানুব মতো স্থির। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। এবং তারপরই মেজ আর ছোট হতভম্ব হয়ে দেখল কী করে সাদা শাড়িতে মোড়া বড় বৌর সুগঠিত দীর্ঘ দেহ তীর্যক হয়ে পানি কেটে, তীব্র বেগে সাঁতরে চলছে পাতাটার দিকে। দু'জনেই গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। দেখতে লাগল বড় বৌর এই নতুন রূপ।

দু'হাত দিয়ে পাতাটাকে ঠেলতে ঠেলতে বড় বৌ ফিরছে বিজয় গৌরবে। পানিতে ঢেউয়েব তালে তালে লাথি মারছে আব মাঝে মাঝে মুখ পুরে পানি নিয়ে ওপরের দিকে ফোয়ারার মতো করে ছুঁড়ছে— ঠিক যেন একটা সাদা ক্ষুদে তিমি মাছ।

এমন সময় হঠাৎ যেন ককড়াৎ ককড়াৎ করে আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল। দক্ষিণপাড় থেকে ছোট বৌ একটা আতঙ্কিত, বিভৎস চিৎকার করে উঠল— হালুম। বড় বৌ পাড়ের দিকে তাকিয়েই দেখলে পশ্চিম পাড়ের আনারস ঝোঁপের ফাঁকে একটা নিকশ কালো মুখ, কাঁচা পাকা দাড়িতে ঢাকা। আর লক্‌লকে কাটাপাতার ফাঁক দিয়ে সে মুখের শুধু একটা চোখ স্থির হয়ে জ্বলছে। বড় বৌর মনে হলো তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আর পানির নিচের মাটি থেকে কী একটা যেন ক্রমশ তাকে কেবল টানছে। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ পুকুরের চার পাড় কাঁপিয়ে, নারকেল সুপারি বাগানের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল একটা বিকট বিস্ফোরিত অট্টহাসি। চোখটা নেচে উঠল, দাড়ি দুলে উঠল। আশরাফ মুনশি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেও ক্রমাগত হাসির তোড়ে অট্টধ্বনিতে ভেঙে পড়ছে। তারপর একটু সামলে বগলের হরেক রকমের পুঁটলিগুলো দু'হাতে উঁচু করে ধরে দরাজ গলায় হাঁক দিল— নিবি নিবি, জলদি করে আয়। তোগো লই ফুলতেল আন্‌ছি রঙ্গ সাবান আইনছি চুড়ি আইনছি। নিবি তো জলদি করি আয়'।

আশরাফ মুনশি মোকদ্দমায় জিতেছে। এবং সেই খুশিতে দশক্রোশ পথ এক হাঁটাতেই পাড়ি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। ব্যাপারটা চোখের পলকে পবিষ্কার হয়ে আসতেই কিছুক্ষণ আগেব ভীতস্তম্ভিত তিনটি বৌ-ই নতুন আলো, নতুন প্রাণ পেল। ছুটতে শুরু করল তিনজন; পশ্চিম পারেব আনারস ঝোপের দিকে। দু'জন ডাঙায় দৌড়ে, একজন পানিতে সাঁতরে।

আর পবিত্যক্ত বাক্সা পাতাটা তবঙ্গায়িত পুকুবেব মাঝখানে তখন ভাসছে অত্যন্ত করুণভাবে।

ফিডিং বটল

সাজ্জাদ দুই তিনবার গা মোড়ামুড়ি দিয়া ঘুমের জড়তা কিছুটা ঝাড়িয়া লইল। প্রশস্ত বিছানার অপর পার্শ্বেই তন্বী স্ত্রী ঝুঁকিয়া পড়িয়া নবলব্ধ শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছে। সাজ্জাদ ঘাড় ফিরাইয়া ম্যাডোনা মূর্তির এই বাংলা সংস্করণ হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উন্মুক্ত অনুভূতি দ্বারা রস পান করিতে লাগিল। শায়িত অবস্থাতেই হাত বাড়াইয়া বালিশের নিচ হইতে ম্যাচ এবং সিগ্রেট কেস হস্তগত করিল। ছোট খোকা, ফিডিং বোতল চুক চুক করিয়া চুষিতেছে। মাতা তাহার মুখের সামনে নিবিষ্ট মনে ঝুকিয়া পড়িয়াছে— অনতিদূরে স্বামী চুষনির শব্দের সাথে তাল মিলাইয়া ধুঁয়ার রিং ছাড়িতেছে। সমস্ত বিশ্বের দাম্পত্য জীবনের ছবি যেন পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ পাইল।

হামাগুড়ি দিয়া গড়াইয়া সাজ্জাদ মাতাপুত্রের নিকটে সরিয়া আসিল। তারপর আচমকা ভ্রূ কুচকাইয়া একবার নিজের স্ত্রী আর একবার পুত্রের দিকে সঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। স্ত্রী আবেদা অস্থির হইয়া ওঠে। জিজ্ঞাসা করিল : 'অমন করছ কেন ?'

'না দেখছি।'

'কী দেখছো ?'

সাজ্জাদ সহসা ছোট খোকার চোখের কাছে চোখ লাগাইয়া কী যেন দেখিল। মুখ ঘুরাইয়া আবেদাকে প্রশ্ন করিল। 'খোকার মুখ ধুয়েছিলে ?'

আবেদা কোনও উত্তর দিল না। নির্লিপ্ত ভংগিতে শুধু ফিডিং বোতলটাকে আরেকটু কাত করিয়া শিশুর দুই ঠোঁটের মাঝে ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিল। নাকের নীচে এক টুকরা হাসির কল্পিত গুড়া লাগিয়া! সাজ্জাদ ক্ষেপিয়া গেল। তারপর দৃঢ় স্বরে, 'উত্তর দিচ্ছ না যে বড় ?'

'কীসের ?'

'খোকার মুখ ধুয়েছিলে কি না ?'

'বা, মুখ না ধুইয়ে দুধ আমি খাওয়াতে যাব কেন ?'

'মুখে দু-ঝাপটা পানি ছিটিয়ে বাসি আঁচল দিয়ে মুছে নেওয়াটাকে ধোয়া বলে না।'

'এই ভোর বেলায় তোমার সাথে তর্ক করতে আমি রাজি নই।'

'মানে, আমার ছেলেকে তুমি নোংরা করে যা তা অযত্ন দেখাবে আর আমি কিছু বলব না ?'

'ছেলে তোমার একলার নয়।'

'হ্যাঁ, ছেলে আমার একলারই।'

'না—'

'হ্যাঁ— শুধু আমারই ছেলে।'

'না, তোমার নয়, শুধু আমারই।'

বিবাহিত জীবনের বিশ্বরূপ আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চপদস্থ তরুণ সরকারি কর্মচারী

সাজ্জাদ তখন হিংস্র পিতার মূর্তি ধারণ করিয়াছে, গর্জন করিল, 'না, আমার ছেলেকে অযত্ন তুমি করতে পারবে না।'

এবং সাথে সাথেই সাজ্জাদ ক্ষিপ্র হস্তে ফিডিং বোতলটা ছিনাইয়া লইয়া জোরে জানালা পথে ছুঁড়িয়া দিল। ছোট খোকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ফিডিং বোতলের ভাংগিবার চূর্ণিত শব্দকে ছাপাইয়া গেল। উপর হইতে দোর্দণ্ড শব্দে মা, ভাই, বোন ছুটিয়া আসিবার পূর্বেই কলেজে পড়ুয়া আলোকপ্রাপ্তা আবিদা বেগম তখন ঘরের বৌ'র স্বাভাবিক নম্রতা ভুলিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় খিঁচাইয়া উঠিল। দ্রুতগতিতে পাকের ঘর ইতে দুধের সসপ্যানটা আনিয়া খপ করিয়া স্বামীর সম্মুখে ফেলিল। তারপর বহ্নি নয়নের সাথে বাহির হইল স্ফীত উচ্চারণ : 'এই রইল তোমার দুধ আর এই রইল তোমার ছেলে, যত পার এখন আদর-যত্ন কর।'

রাগে সাজ্জাদ নির্বাক। নিষ্পলক দেখিতেছে কী করিয়া আবিদা একটা বিদেশী উপন্যাস হাতে লইতেছে। তারপর পাকের ঘরে যাইয়া নিবিড় হইয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় সেই গল্পের বই'র মাঝে নিজেকে বিলাইতেছে। সাজ্জাদ চিৎকার করিয়া উঠিল। 'আনু— আনু।'

বিধবা ছোট বোন আনোয়ারা আসিল।

'নে ঐ ডাইনির কাজ নয় সন্তান পালে। তুই নিয়ে যা, ওপরে নিয়ে তোর কাছেই রাখবি এখন থেকে। বুঝলি ? মাকেও এই বলে দিবি।'

মা ততক্ষণে নিচে নামিয়া আসিয়াছে। দূর দূর করিয়া ছেলেকে গালি দিয়া উঠিল। সাজ্জাদ অটল। আরেকবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে আনোয়ারা খোকাকে কোলে লইয়া আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিল না। আস্তে আস্তে উপরে চলিল। মাও পিছু লইলেন।

সোফা হইতে দৃপ্ত কদমে আবিদা উঠিয়া আসিয়া সশব্দে মাঝখানের দরজাটা রুদ্ধ করিয়াছিল। সাজ্জাদ একাগ্র চিত্তে কান পাতিয়াও বুঝিতে পারিল না ঘর হইতে যে মৃদু শব্দের রেশ থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল তা উপন্যাসের পাতা উল্টাইবার না ফোঁপানির কান্নার চাপা প্রতিধ্বনি। জানালার কাছে তখন আনোয়ারার ছোট ভাই রশিদ, রশিদের ছোট বোন জাহানারা, তারপর যথাক্রমে তিনু, মনু সব ভীড় করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মজা দেখিতেছে। সাজ্জাদ মুখ বিকৃত করিতেই তারা এক ছুটে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বেলা বারটা বাজে। দৃশ্য পূর্ববৎ।

সাজ্জাদের আম্মা বৌ'র অনাগত দ্বিতীয় সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া একটু শংকিত হইলেন। আবিদার অংগে গণ্ডে হাত বুলাইয়া অনুরোধে করিলেন, 'বৌ, তোমার শরীর খারাপ, এখন উঠে কিছু খাও।' আনোয়ারা যোগ দিল।

'তুমি কি চাও আজ সারা দিন না খেয়েই থাকবো ?'

আবেদ চুপ করিয়া রহিল।

জাহানারা যথাসম্ভব দরদ ভরা সুরে— 'ভাবি তুমি ভাত খাবে না ?'

তিনু মনু সাহস করিয়া আবিদার দুহাত ধরিয়া ফেরসে বলিল, 'ভাবি উঠ, চল না খেতে যাই!'

এবার আবিদার ধৈর্যের বাঁধ ভাংগিল। হাতের বইটা শূন্যে ছুড়িয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল— 'এটা কি চিড়িয়াখানা না কি ? আমি কিছু খাবো না— খাবো— না।'

ব্যাকুল কণ্ঠে আম্মা দুর্বার অনুরোধ করিল। 'লক্ষ্মী বৌ এমন কোরো না। তোমার নিজের আম্মা এসে যদি আজ অনুরোধ করতো তাহলে কি আজ তুমি তা ঠেলে ফেলতে পারতে ?'

'আমার নিজের আম্মা হলে এমন অনুরোধ করতেনও না।'

আম্মা এবার সত্যি ব্যথিত হইল। পাশের ঘর হইতে সাজ্জাদ জোরে জানাইল : 'আম্মা আপনি কেন ঐ গোয়ারটাকে শুধু শুধু অনুরোধ করছেন ? চলে আসেন। ক্ষিদে লাগলে আপনি ও খেয়ে কুল পাবে না। রশিদ, আনু, মনু তোরা চলে আয়।'

বেলা দুইটা। পরিস্থিতির কোনই পরিবর্তন নেই। সাজ্জাদ ঘর জুড়িয়া পায়চারি করিতেছে আর আবিদাকে শুনাইয়া শুনাইয়া আনোয়ারার নিকট গরগর করিতেছে।

'খাবে খাবে আপনিই খাবে! একটু পরেই যখন দাঁত কপাটি লেগে বেহুঁশ হয়ে উল্টে পড়বেন তখনই গিলবেন। রশিদ তুই চলে আয় এখানে। আয় তাস খেলি বসে বসে।'

বশিদ তার ভাবির সামনে হইতে উঠিয়া বন্ধ দরজা একটু ফাঁক করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিল। সাজ্জাদ তাসের প্যাকেট খুলিয়া শাফল করিতেছে। কিছুক্ষণ খেলা চলার পব— 'মিঞা ভাই কী খেলছ তুমি ? তোমার তো রানিং ফ্লাশ খামোকা এত আগেই ছেড়ে দিলে কেন ?'

সাজ্জাদ কর্ণপাত করিল না। অকস্মাৎ কানের কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল— 'এই তুই দেখ না একবার। তোর সংগে ত অনেক খাতির, তুইই দেখ না তোর ভাবিকে বলে কয়ে কোনো রকমে খাওয়াতে পারিস কিনা। পারলে, বুঝলি দুটো দু'দুটো টাকা তোকে দেব। রশিদ বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। সাজ্জাদ ভাইর ঐ হাম্বিতাম্বির গোড়ায় তা হইলে এই। সুযোগ পাইয়া রশিদ এবার উপরিহস্ত চালনা করিতে ছাড়িল না। যেন চলিয়াছে এমনি গম্ভীর কণ্ঠে জানাইল, 'আচ্ছা, আমি দেখছি একবার চেষ্টা করে মিঞা ভাই— ঘাবড়াবেন না।'

সাজ্জাদ ভাই তখনও তাঁর আত্মসম্মান আঁকড়াইয়া পূর্ণ গাম্ভীর্যের সহিত বসিয়া রহিলেন। উচ্চকণ্ঠে চাকরকে ডাকিলেন, 'এই, একটা টেলিগ্রাম ফর্ম নিয়ে আয়। ওর আব্বাকেই একবার টেলিগ্রাম করে দি। নিজের মেয়েকে এসে নিয়েই খাইয়ে বাঁচাবেন। আমার কী ?'

কিছুক্ষণ পরে রশীদও পাশের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল। মুখ গম্ভীর। আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চোখের পানি রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে নিম্নকণ্ঠে যে বিবৃতি দিল তাহার অর্থ এই সে তাহার পক্ষ হইতে কোনরকম ত্রুটিই হয় নাই। কিন্তু তাহার নসিবে নাই তা টাকা দুই বা সে আর কী করিযা পাইবে। ভাবির দুই পায়ের উপর হইয়া সে অনুরোধ সত্যই করিয়াছিল। এমনকি ভাবাবেগে কাঁদিয়া পর্যন্ত ফেলিয়াছিল। তাহার আশায় ছাই ফেলিয়া ভাবিও নাকি উল্টা কাঁদিয়া ফেলিল। এবং জানাইল যে রশিদ ছেলে মানুষ, সে এসব বুঝিবে না। ব্যাপার এখানে অন্যরকমভাবে গুরুতর। রশিদ চটিয়া গিয়াছে— অন্য রকম কী ? তাহার জ্বলজ্যান্ত দুই টাকা খামোকা মারা যাইতেছে। আর ব্যাপার কিনা অন্যরকম যা সে বুঝে না। হুর।

বেলা চারটা। উত্তেজনার করাল ছায়া ঘন হইয়া উঠিয়াছে। আনোয়ারা অন্য পাশের ঘরে ছোট খোকাকে চিমটি দিয়া কাঁদাইয়া দেখিয়াছে— উত্তর আসিয়াছে— 'যে ছেলে কাঁদে তার মা মরে গেছে!'

সব্বাই আশা ছাড়িয়া দিল। শেষ উপায় সাজ্জাদের নিজের হাতে। কিন্তু সাজ্জাদ না হয় তার আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিল— তাহা হইলেই সে সকল সমস্যার সমাধান তাহারই বা এমনকি সুনিয়শ্চতা আছে ? তখনও যদি আবিদা গোঁ ধরিয়া থাকে ? আনোয়ারা শুধু ঘাড় নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া জানাইল— 'নারে না তা হয় না। এই রহিল তোর খোকা— এবার তুই দেখ।'

অন্তর যুদ্ধে জর্জরিত, মলিন বসনে সাজ্জাদ আরও কিছুক্ষণ নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে কী সব চিন্তা করিল। তারপর বীরের মতো কণ্ঠ করিয়া ঘোষণা করিল— 'আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু তোরা সব আগে উপরে যা।— যা শিগ্‌গির।'

বসিয়া আনোয়ারা, তাহার পিছনে মেষ মাবকের মতো তিনু, মনু ও সবার শেষে ধীর পদবিক্ষেপে রশিদ সিঁড়ি দিয়া উপরের ছাদের কোঠায় চলিয়া গেল। সাজ্জাদ পেছন পেছন দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমিনা আগে হতেই সেখানে অশ্রুসিক্ত বদনে অজু করিয়া তসবি গুণিতেছেন।

যখন আশংকায় প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, নিঃশ্বাস বসিয়া থাকিতে থাকিতে রশিদেব অসহ্য বোধ হইতেছে। তাহার উপর অনিশ্চয়তার এই মানসিক চাপ। সেই উঠিয়া দাঁড়াইল। আতংকে ভয়ার্ত অংগভঙ্গীর দ্বারা সবাই তাকে বসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রশিদ বেপরোয়া। এমন নির্জীব হইয়া জড়পিণ্ডের মতো আর কতক্ষণ ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা চলে?

পা টিপিয়া টিপিয়া সে নিচে আসিল। তারপর জানলার একটা সংকীর্ণ খড়খড়ির ফাঁক দিয়া ঔৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল ভাবি দিব্যি আরামের সংগে পা ছড়াইয়া পাশেব প্লেট হইতে ছানামাখা একটি একটি ক্রিম ক্র্যাকার তুলিয়া মুখে দিতেছে আব তার সাজ্জাদ ভাই সমস্ত পুরুষজাতির কলংক হইয়া সেই বিস্কুটে মাখন লাগাইতেছে। উভয়ের মধ্যস্থলে ছোট খোকা এক নতুন ফিডিং বোতল হইতে মহানন্দে চুকচুক কবিযা দুধ খাইতেছে।

বাবা ফেকু

চিবুকের ডান দিকে রগটা কাটা। ছোটকালে বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে গিয়ে ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটে। অনেক চিকিৎসে করেও ওটা আর পরে ভাল করা যায় নি। এখন সব সময়েই ওটা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে— লালাক্ত পানি। উষ্ণ লবণাক্ত স্বাদ।

লোকটা নাকি একেবারে কসাই। জীবনে নাকি কোনদিন কাঁদে নি। হয়ত চোখের পানি গালের ছেঁদা দিয়ে বেরুতে সব ফুরিয়ে গেছে।

ফেকু মিঞার প্রতিপত্তি অবশ্য এতে কিছু কমে নি। কায়দা করে থুতনির বুকে রাখা হয়েছে কয়েক গাছি দাড়ি। কাঁধের ওপর সব সময়ই থাকে একটা পুরু গামছা। এমন সুনিপুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডান কাঁধটাকে ওপরে দিকে অর্ধ চক্রাকারে টেনে তুলে ফেলবেন যে আবার নামিয়ে আনায় সময় কেউ বুঝতেও পারবে না যে এবি মধ্যে ফুটো রগটা বেশ করে মোছা হয়ে গেছে। খুতনি বেয়ে দাড়ির গোড়া ধরে সেই পানি বড় জোর দাড়ির মাথা অবধি এসেছে একটা স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতিতে যান্ত্রিক কাঁধটা অমনি সব মুছে নেবে ভাঁজ করা গামছায়—

খান বাহাদুর গোফরান সাহেবের ভাগ্নে হন ফেকু মিঞা। দোর্দণ্ড প্রতাপ তাই ফেকু মিঞার সমস্ত শহর জুড়ে। দুষ্ট লোকে বলে ফেকু মিঞা খান বাহাদুর সাহেবকে তুক করেছে। তা নইলে ওর এত নষ্টামি গোফরান সাহেবের মতো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী গোড়া নিষ্ঠাবানের চোখ এগিয়ে যায়! তিনি ত অর্ধচক্ষু সস্নেহে মুদে 'বাবা ফেকু' ছাড়া ভাগ্নেকে ডাকতেই পারেন না। আসল কথা ফেকু মিঞা মন্ত্রও জানে না, তুকও করে নি; সে শুধু বুদ্ধিমান। সে জানে বুড়ো মানুষের ভাঙন ধরা মনের প্রতিটা ফাটল। জানতো কোথা থেকে আক্রমণ করলে পরে অত বড় আলেম এবং অভিজ্ঞ সংসারি গোফরান সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও তার সমস্ত বিরাটত্ব গুটিয়ে আশ্রেয় খুঁজবে ভাগ্নেব রোমশ বুকে।

সন্ধের পর—

গবমে টিকতে না পেরে একটা শীতল পাটিতে শুয়ে বারান্দায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মোটরে সারাদিন মফস্বল করে গাটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। খাস খিদমতগারটা একবার এসেছিল গা টিপে দেবার জন্যে। নিষেধ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আদর্শবাদী গোফরান সাহেব চান না যে তাঁর নিজের সন্তানেরা শিখুক যে টাকা পয়সা বেশি হলে চাকরবাকর দিয়ে পা টেপানো আভিজাত্যের নমুনা। নিজের কষ্ট হোক তবু ছেলেমেয়েদের সামনে সে আদর্শ তিনি কোনও দিনই স্থাপন করবেন না। হঠাৎ পায়ের কাছে কার অত্যন্ত মোলায়েম স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন, 'কে রে ?'

গোফরান সাহেব খাস অভিজাত কিন্তু ঘরে কথা বলেন দিশী ভাষায়, বাইরে শান্তিপুরী, চাকরবাকরদের সঙ্গে উর্দু।

'মামুজি আঁই!'

'ওহ্! বাবা ফেকু নি ?'

ফেকু মিঞা তখন নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে মামুজি পা-উরু গলদঘর্ম হয়ে টিপছে। অর্ধচক্ষু মুদে গোফরান সাহেব,

'বাঁচি থাক, বাঁচি থাক বাবা!'

ফেকু মিঞার মুখের পেছনে মেঘ ছিঁড়ে রেলিঙের ওপাশে আস্তে আস্তে চাঁদটা আবার ভেসে ভেসে উঠল। ফেকুর প্রতিটি চাপে গোফরান সাহেবের ঘুমের স্তর যেন আরো ঘন হয়ে আসছে। আচমকা তন্দ্রা টুটে গেল। পায়ের উপর যেন কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল— গরম। ফেকু কাঁদছে নাকি ?

'বাবা ফেকু— কী অইছে ?'

'কিছু না মামু জান।'

'কান্দনি তুঁই— এ্যাঁ ?'

এমন এক কণ্ঠস্বরে এর প্রতিবাদ এল যে গোফরান সাহেব বুঝলেন যে ফেকু কাঁদছে।

'বুঝছি, আঁর কাছে তোঁয়ারা কাকে সব লুকাই রাইখবিই। কইত্যি ন্য ?'

'কী কইতাম ?'

'কান্দস ক্যা ?'

'কৈ কাঁইদলাম ?'

'হাছানি। তৈলে গরম পানির হইড়ল কোনানতন।'

ফেকু এবার সত্যি ডুকরে ফুঁপিয়ে উঠল। ঝরঝর করে আরো কয়েক ফোঁটা গবম পানি পড়ল গোফরান সাহেবেব পায়ের উপর।

'চোখের পানি ন্য মামুজি, আঁর বুকের রক্ত হইড়ছে আম্মার পায়ের উপর। খোদা তাঁকে বেহেস্তে নেন— আইজ যদি আইন্যের বড় ভাই বাঁচি থাইকত—'

লক্ষ্য এবার অব্যর্থ। মৃত প্রিয় বড়ভাইর কথা এমন করুণ কণ্ঠে দরদীর মুখে শুনে গোফবান সাহেব নিজেই আর চোখের পানি চাপতে পারলেন না। একটু থেমে ফেকু বলে, 'আঁবে কত আদর কইত্য।'

কাঁদতে কাঁদতে গোফরান সাহেব মনে করে উঠতে পারলেন না— সত্যি তার মরহুম ভাই ফেকুকে ঘৃণাই করত না খুব ভালবাসত। শুধু বললেন, 'হেই কথা আর কইছ্যারে বা

'কইত্যম ন্য ক্যা— আইজ— যদি হ্যাতে বাঁচি থইকত তই কি— ক্যালা দুইশ টাঁয়ার নাই বিশ কানি জমি ডিক্রি ত উঠত ? মাইনষে আঁর বাড়িঘর ক্রোক করণের ক্যতা কইত ?

চোখের কোণা মুছে গোফরান সাহেব ধীরে প্রশ্ন করলেন, 'ডিক্রি জারির তারিখ কবে ?'

এর পবের সব উত্তর ফেকু মিঞা দিয়েছে আংকিক নিয়মে হিসেব করে। দরদী দেবার কথা ভাবেও নি। ভাববার তার অবসরও ছিল না। সে তখন ভাবছিল আর কত টাকা হলে আগামী ছুটিতে বাড়ি গিয়ে পাটারীদের জমিটা কিনতে পারে।

আর ভাবছিল চাম্বেলীর কথা। গোফরান সাহেবের বাসায় সুন্দরী কিশোরী চাকরাণীর কথা। ও মাগী অত সুন্দরী হলো কী করে ? ওর বাবাকে ত সে দেখেছে। না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরে পড়েছিল— পরনে একটা নেংটির মতো ছেঁড়া লুংগি— চেহারাটা কুৎসিত আর বছর বারকের একটা হ্যাংলা মতন মেয়ে মুর্দার বুকের উপর মুখ থুবড়ে কাঁদছিল। এখন চাম্বেলীব

বয়স কত ? ষোল ? এত কম ? আমাব নিজেব বয়স কত ? ছত্রিশ ?— না-না-ত্রিশ আরো কম। পঁচিশ। দেখতে ত সে কত জোয়ান। আরো কম। একুশ।

ডান হাত দিয়ে চোখটা মুছলো। যন্ত্রচালিত চক্রের মতো গামছা বসান ডান বাহুটা উর্ধ্বমুখী চক্রাকারের ঘুরে এল, ডান থুতনি ঘেষে সিক্ত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ঘঁষে।

চাম্বেলী তখন জোছনায় ভরা ছাদের উপর অস্থির চিত্তে ঘুরছে। নারকেল তেলে চুবিয়ে আঁট করে বেঁধেছে চুল। খোপায় বসিয়েছে লাল পলাশ। হাতে একটা বকুলফুলের মালা। কেরামত এখনও আসছে না কেন ? সারাদিন অত পানি তুলতে হলে গায়ের ব্যথাতেই ওর হাড়গোড় নিশ্চয়ই গুঁড়ো হয়ে যেত। কিন্তু কী জোয়ান তার কেরামত! এতদিন তার সঙ্গে এক সাথে হেসেছে, কত গল্প করেছে, তবু কোনদিন একটুও গায়ের কাছে ঘেঁষে বসতে চায় নি। একলা নিরালা জায়গা হলে, বরঞ্চ তাড়াতাড়ি কাজের অজুহাত দিয়ে পালিয়ে গেছে। আজ আসুক। এই ফুলের মালা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে সব কথা খুলে বলবে। তারপর কাল ভোরে দুজনে গিয়ে আব্বার পায়ে কদমবুচি করে হুকুম চাইবে বিয়ের। তাদের মনিব নিশ্চয়ই রাজি হবেন।

ভাবতেও চাম্বেলীর গা শিউবে ওঠে, বুক দুর দুর করে ? কেরামত একলা বলতে পারবে কি ? এতবড় জোয়ান হলে কি, একদম ভীতু ও। হঠাৎ ওর খেয়াল হয়,— আচ্ছা, ফেকু মিঞাকে বললে হয় না ? উনি বললে আব্বা নিশ্চয়ই মানবেন।

ছাদের মধ্যের একটা ছোট খুপরির ভিতর দিয়ে গোফরান সাহেবদের ড্রইংরুম দেখা যায়। ভাবতে ভাবতে চাম্বেলী সেই খুপরিটার ধারে এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলো পড়ায় সিল্কের একটা বড় সোফা পরিষ্কার দেখা যায়। দুজনে বসে কথা কইতে কত আরাম কত নরম। কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন দুপুরে সব গেছে বেড়াতে, মুনিবও আফিসে। কী একটা জিনিসের খোঁজে ও এসেছিল এই ড্রইং রুমে। চলেই যেত, কিন্তু হঠাৎ কী জানি মনে হলো। ইচ্ছে হলো একবার বসে দেখতে। কেমন লাগে ঐ গদিওয়ালা চক্‌চকে চেয়ারে বসতে! বসেই সে উঠেও যেত, কিন্তু কী যে তার খেয়াল হলো— ভাবল কেউত আর এখন এখানে আসছে না, একটু বসতে দোষ কী ? কুর্সি ত আর খয়ে যাবে না। পায়ের ওপর পা দিয়ে সে ভাবছিল,— ও পাশে বসবে এসে কেরামত। তারপর ওর কোলে মাথা রেখে এমন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে সে। আর এমনি পোড়া কপাল যে টের পেল না কখন সে নিজে সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে সে যেন আবার তাদের বাড়িতে ফিরে গেছে। গোয়ালে গরু, মড়ায় ধান! দুর্ভিক্ষ নেই। উঠোন ভরা ধান সিদ্ধের গন্ধ। দুপুর বেলা পেট ভরে ভাত খেয়ে খড়ের গাদার উপর শুয়ে সে ঘুমোচ্ছে। চারিদিকে সোনালি তুলোর মতো রাশি রাশি খড়। ধানের গন্ধ যেন এখনও ওদের গায়ে লেগে। কী নরম— কী তুলতুলে। এসব ছেড়ে বাবা কেন তার হাত ধরে নোংরা শহরে চলে এল ? কিন্তু খড়ের গাদার ওপাশে কেরামত কী করে এল ? চোখে দুষ্টুমি বুদ্ধি। হাতে একটা শুকনো, সূক্ষ্ম খড়। ওহ! সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙাতে আসছে না ? মনে করেছে সে বুঝি এখনও টের পায় নি। আচ্ছা, কাছে আসুক! আরো জোর করে চাম্বেলী চোখ বুঁজে রইল।

কিন্তু ঘুম তার ভাঙল! চোখ কচলে সব ব্যাপারটা বুজবার আগেই পরপর আরো কয়েকটা লাথি এসে পড়ল ওর কাঁধে, পিঠে, কোমরে! সোফা থেকে ছিটকে পড়ে ও গোঁ গোঁ কবছে আর ফেকু মিঞার এলোপাথাড়ি মার চলছে— পা থেকে মাথা অবধি।

'দেখছেন নি মামী আম্মা, হারামজাদির সাহস।'

'গুমোর কত, এখনও হুশ আছে—!' লাগা আরো। বললে কেউ।

বকুল মালাটা চুলের খোপায় জড়িয়ে চাম্বেলী খুপরি ছেড়ে একটু সরে আসে! ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর এক মুহূর্তও তার প্রবৃত্তি হয় না।

সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল তার, যখন সে দেখল সে অফিস থেকে ফিরে এসে গোফরান সাহেব তাকে নয়,— চাবকাচ্ছে চাকর কেরামতকে। কে লাগিয়েছে সব দোষ নাকি কেরামতেরই, চাম্বেলীকে সেই সাহস দিয়েছে ওখানে শুতে, আর বিপদ বুঝে ব্যাটা নিজে শট্‌কেছে।

তবু সে ফেকু মিঞার পায়েই পড়বে। যদি ফেকু মিঞা চেষ্টা কবে, তাদের বিয়ে হতে পারে সহজ, সুগম।

'বাঃ বাঃ চাম্বেলী ফুল দ্যেই আইজ বাহারে ফুইটছে।'

শিউরে উঠে চাম্বেলী দেখে পেছনে দাঁড়িয়ে ফেকু হাসছে। সুঁচোল সিক্ত দাড়ি চাঁদের আলোয় জ্বলছে। হঠাৎ ফেকু মিঞার হাসিকে অপ্রতিভ করে দিয়ে চাম্বেলী ওর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

'ফেকু মিঞা আপনে আমার বাপ, যা কন স—ব শুনুম। আমাব এটা উপকাব কইবা দিবেন?'

'দুর দুর, এইডা করস্ কী? সরি যা, সরি যা।'

কয়েক পা পিছিয়ে এল ফেকু মিঞা। শুধু ওকে ঠেলে দেবার সময় ঝুলে পড়া বকুল মালাটা ওর খোপা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল,

'এই ফুল রাইখছস আবার! চুলের মধ্যেও সাপের বাসা বানাইবি নাকি?'

চাম্বেলী কাত্‌রে কাত্‌রে বলছে, 'যা কন সব শুনুম— যা কন। আপনে আমার ধেম্ম বাপ।'

ফেকু মিঞা ধীরে ধীরে সপ্রতিভ হয়ে এল। ব্যাপারটা পুরো আঁচ করে নিয়ে একটু দূবে সরে দাঁড়াল।

'কান্দস ক্যা? ক, করিউম। তোর লাই করিউম, বেশি কি?'

কথার মারপ্যাঁচ বোজার মতো মন তখন চাম্বেলীর নয়। সে শুধু জানে যে ফেকু মিঞার অপ্রতিহত ক্ষমতা, আর জানে, একবার কেরামতকে পাশে পেলেই হয়। নরম পৃথিবীকে আর কিসের ভয়? সব কথা নিঃসংকোচে সে ফেকু মিঞাকে বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চোখে অসহায় মিনতি। হাত রেখে ফেকু মিঞা চোখ সংকীর্ণ করে হাসল।

'সব কমু। করিউম। তবে আজই কইতাম পারি না, কাইল কউম। তবে ইয়ানো থাকিস কাইল। যা কমু করন লাইগব কিন্তু।'

'যা কন্— যা কন।'

ফেকু মিঞার ডান কাঁধটা হঠাৎ ওপরে উঠে থুতনি ঘষল।

পরের দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুতে যাবে এমন সময় সকলে শুনল ছাদের ওপর থেকে চাম্বেলীর একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ছাদে কারা যেন দুদ্দাড় শব্দে ধস্তাধস্তি করছে। সকলে ছুটে ছাদে গিয়ে দেখে ফেকু মিঞার বুকের ওপর বসে বলিষ্ঠ কেরামত এক হাতে দাড়ির অগ্রভাগ ধরে প্রাণপণে ঘুষোচ্ছে— ফেকু মিঞাও প্রাণলাভের জন্য চিৎকার করছে, গাল দিচ্ছে, আর হাত পা ছুঁড়েছে। পাশেই নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে চাম্বেলী—

তৃপ্তিব ঈষৎ আবেগে ঠোঁট কাঁপছে।

দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে সবাই যখন নিচে নেমে এল তখন ফেকু মিঞা শারীরিক বিশেষ কাহিল। বাড়ির প্রত্যেকে এ দৃশ্যে হতভম্ব এবং পরিণতির কথা চিন্তা করে ভীত।

কাঁধের উপর গামছাটা ফেলে সে কাঁধ দিয়ে চিবুকের প্রান্ত মুছতে মুছতে ফেকু মিঞা একটু হাসল। হিসেবে তার খুব ভুল হয়নি। খানবাহাদুর সাহেব বাড়ি নেই— মফস্বলে। কাল ফিরবেন। তবে চাম্বেলী বিবির বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে সে।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। পরের রাত্রে বাতাস করতে করতে ফেকু মিঞা খানবাহাদুর সাহেবের কানে কী মন্ত্র ঢাল্লেন তা কেউ জানে না। তবে শায়িত অবস্থাতেই গোফরান সাহেব রাগে গড়গড় করে উঠলেন— 'আঁর ছাবুকটা লই আছেন।'

ফেকু মিঞা চাবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত নিরীহ কণ্ঠে ডাক দিল কেরামতের নাম ধরে জোরে। ছুটে এল অন্য আরেকটা চাকর। হুমকি দিলেন খানবাহাদুর সাহেব— 'বদমাস তোমকো নেহি, কেরামত কাঁহা ?'

'আব্বা লাই।'

'লাই কেয়া ?'

'চইলা গ্যাছে— পলাইয়া গেছে।'

ফোঁস করে উঠল উত্তেজিত ফেকু মিঞা— হাতে চাবুক।

'তৈ চাম্বেলীরে ডাকি লই আয় ইয়াঁনে।'

'হে-ও'ত চইলা গেছে হেই লগে।'

খানবাহাদুর সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন : 'কেয়া কাহা ?' খানবাহাদুর সাহেবের নধর কাঁধে টুপ্ করে পড়ল কয়েক ফোঁটা পানি— গরম। চমকে উঠে খানবাহাদুর সাহেব অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ্যা, তুই কাঁদ নি ? বাবা ফেকু তুই চাম্বেলীর লাই কাঁইদলা নি ?'

'না না কাঁইনদুম ক্যা মামুজি, এগুন আঁর গালের হানি।'

ক্ষিপ্রবেগে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ফেকু মিঞার ডান কাঁধ। এবং আর এক ফোঁটা চকচকে পানি ধারাল চিবুক গলিয়ে ছুঁচোল দাড়ি ছুঁইয়ে পড়বার আগেই সবটাকে এসে গ্রাস করল একটা অর্ধ-সিক্ত গামছা।

ন্যাংটার দেশে

বশিরুল্লাহ কারীর মিঠে আজানের আগে, চৌধুরীদের লাল ঝুঁটি ওঁচানো মোরগ ডাকেরও অনেক আগে আমিনের বাপ ঘরের মধ্যে গরগর করে ওঠে, ঘাড়ের রগগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু সে অশ্লীল অকথ্য গালি-গালাজের বিরাম নেই; কলেরাগ্রস্ত রোগীর কুৎসিত বমির মতো কেবল গলগল করে বেরুচ্ছেই। কিছু নিজের কুমারী মেয়েকে উদ্দেশ্য করে, কিছু বৌকে, কিছু নিজের মৃত মাকে। আর সবগুলোই গর্ভ সংক্রান্ত। যে জাতির আব্রু রক্ষা করতে সমস্ত শরীর ঢাকতে কাপড়— সোনার কাপড়, বার হাত তের হাত লেপটে নিতে হয়, স্তনে-স্তনে উরুতে-উরুতে থেতলে আমিনার বাপ আজ তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

কুয়াশাচ্ছন্ন আবছা উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমিনার বাপ আরেকবার চাপা গর্জন করে উঠল। রুক্ষ কঠিন হাড়ের কাঠামোব মধ্য দিয়ে অতীতের বিরাট বলিষ্ঠ পুরুষটিকে চিনতে কষ্ট হয় না। দীর্ঘ নগ্ন দেহের মধ্যখানে শুধু অস্পষ্ট পাতলা এক ফালি ন্যাকড়া মতো গামছা জড়ানো।

দুহাত দিয়ে বিশাল দুর্বল দুই উরু চেপে ধরে বিড়বিড় করে কী বলল। চিৎকাব করে খোদাকে ডাকল, প্রতিজ্ঞা করল শহর থেকে আজ কাঁপড় না নিয়ে সে ফিরবে না। এই ল্যাংটা উরু কাপড় না এনে মা-মেয়েকে কোনদিন সে আর দেখাবে না। দেখাবে না। দেখতে দেবে না।

ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুজোড়া ঝাপসা চোখ স্থির হয়ে দেখে কী করে আমিনার বাপ বড় বড় পা ফেলে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল— শহরের পথে।

শহর মানে, নোয়াখালী শহর। এখান থেকে কম করে হলেও ত্রিশ মাইল হবে। মইয়ের মতো হাড় বের করা অতবড় পা দিয়ে একটানা চললেও চব্বিশ ঘণ্টার আগে আমিনার বাপ কখনো ফিরতে পারবে না।

আরেকটা ব্যাঙ দেখতে পেয়ে খুশিতে মকুর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। সন্তর্পণে ডান পা'টা তুলে আরেকটু সামনে ফেলে। পাকা শিকারীর পা, পানি নড়ল কিন্তু শব্দ হলো না। ব্যাঙটা তার চেয়েও পাকা, মকুর খাপ-পাতা হাত ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে আসবার আগেই তিড়িক করে এক লাফে আর একটা ধানের গোড়ায় গিয়ে বসে। দুলে ওঠা ধানশিষটার দিকে নজর রাখতে-রাখতে মকু হতচ্ছাড়া ব্যাঙটার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে মুখে মুখে একবার যৌনসংগম করে ফেলে। তার পরই পা টিপেটিপে মকু শ্যাওলা পড়া ধানের জলা ঠেলে খুঁজতে থাকে ব্যাঙ। ডোরা কাটা সোনালি হলুদে চকচকে ক্ষুদে ব্যাঙ। এই ভর সন্ধ্যার আবছা আলোতেও চকচক করে জ্বলে ওগুলোর রঙ। হোক্কা ভাই বলেছে এ ব্যাংকগুলো নাকি শৌলমাছের চরম টোপ। ভোররাতের অন্ধকারে চৌধুরীদের ছাড়া পুকুরেব পাড় দিয়ে পানির ওপর একবার নাচতে পারলেই হলো। গবাগব ধরবে।

কোমরে বাঁধা ব্যাঙ-এর পুটলিটা একবার টিপে দেখে শুকনো : আরও কিছু ধরতেই হবে। একটা তুলতুলে ব্যাঙ হাতের মুঠোয় থেতলে আধমরা করে কোমরে গুঁজতে-গুঁজতে ওর হঠাৎ আমিনার কথা মনে পড়ে।

দুপুরের শেষ দিকে চারিদিকে যখন নিরালা হয়ে আসে আমিনা তখন ছাড়া পুকুরে পানি নিতে আসে। আজো এসেছিল মার ঘরে বসিয়ে মার নীল শাড়িটা পরে। একে ত আমিনার বাড়ন্ত গড়নের পরিপুষ্ট শরীরে মায়ের ক্ষয়ে যাওয়া পুরানো শাড়ি ভাল করে বেড় খায় না, তারপর চারিদিকে যখন কেউ নেই কিম্বা কেউ আছে জেনেই যেন আমিনার হাতের টানে কাঁখের কলসির চাপে শাড়িটা আরও ছোট হয়ে সরে পড়ে যেতে চায়। কলসির ধাক্কায় পা না সরিয়ে আমিনা একবার এদিক সেদিক কাকে খোঁজে। না পেয়ে আরো জোরে ধাক্কা দিয়ে আবাব চোখ তুলে এদিক সেদিক দেখে। বিরক্ত হয়ে ঢকঢক করে কলসি ভরে আমিনা উঠে দাঁড়াতেই দেখে বড় নারকেল গাছটায় আড়াল থেকে মুখ বার করে মকু হাসছে, পরনে তার একটা লাল সবুজ ডোরাদার নতুন গামছা, পরিপাটি করে কাছা দেয়া। আঁচলের কোনও বাড়তি অংশ ছিল না। তবু এখানে সেখানে দুএকটা অনাবশ্যক আকর্ষণ করে বেগানা পুরুষের উপস্থিতি সর্বাঙ্গে স্বীকার করে লজ্জাশীল তন্বী উচ্চারণ করল : হাক করি ছাই রইছ ক্যা ? মাইয়া হোলা দেইখলে বুঝি আর চোখের হাত হালাইতা মন কয় না ?

মকু স্বভাবত লাজুক হলেও এ সনাতন ধমকে বিচলিত হয় না : যেখানে পানিতে ভিজে শাড়ি আছে কি নেই কিম্বা যেখানে পানিও পড়েনি শাড়িও পড়েনি অত্যন্ত সাবলীল নির্লজ্জতার সঙ্গে তা নিরীক্ষণ করতে-করতে জবাব দিল— 'হ্যাঃ তুইও এক মাইয়া হোলা আর আঁরও এক হৈরা চোখ! হানি লইছিলি যা আঁই ইঁয়ানো আছি হৈলমাছ টোকাইতাম, তোরে না বুইঝ্যৎ ?'

নিজের ছোট শাড়িতে ঢাকা বড় দেহটার প্রতি আঙুল দেখিয়ে আমিনা থলথল করে ওঠে, 'হৈলমাছ বুঝি ইয়ানো ?'

এরপরেই অবশ্য ঠাট্টা করতে করতে মকু এক সময় আমিনার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে যে কাল ভোরের মধ্যে ওদের বাড়িতে সে শৌলমাছ পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবেই। তাব পবেই না হোক্কা ভাইর কাছে আসা পরামর্শের জন্যে। হোক্কা ভাই ওস্তাদ লোক, না পারে এমন কিছু নেই। আজকাল কেবল কেমন যেন মুখ ভার কবে থাকে। চুরি করতেও বেবোয় না, বলে পোষায় না।

খপখপ করে মকু আরো কয়েকটা ব্যাঙ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাড়ির পথে চলতে চলতে ভাবে এগুলোকে কী করে পুটলি করে পানিতে চুবিয়ে রাখবে একদম মবে না যায়। শেষ রাত অবধি আজ রাখতে হবে ত।

শেষ রাতে আমিনার ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে-শুয়েই সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে নিজের রহস্যময় শরীরটাকে নিবিড়ভাবে একবার অনুভব করে নেয়— কী নিটোল ভরাট স্বাস্থ্য, কোথাও এতটুকুন ফাঁকি নেই। নিজেকে সে যেন ঘুমের মধ্যে হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে পেয়েছে এমন একটা খুশির হাসি নিয়ে আমিনা উঠে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় এসে ভাল করে একবার চারিদিক দেখে নেয়। অবশ্য সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুহাত দূরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে দেখা যেত কিনা সন্দেহ। তুব অনেক দিনের অভ্যেসমতো, ঘর থেকে বেরিয়েই আমিনা তবু দুহাত জড় করে নিজের নগ্ন বুককে ঢাকা দিতে চায়। তাবপব আচমকা দুহাত লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়ে সহজ হয়ে চলতে শুরু করে।

চলতে-চলতে আমিনা থেকে থেকে হেসে উঠেছিল। কী অদ্ভুত আজ প্রায় এক মাস ধরেই ত ওরা মায়ে-ঝিয়ে এক কাপড়ে চলছে!

চলে। তবু এখনও অন্ধকার নিরালা রাতে ন্যাংটা হয়ে হাঁটতে ওর লজ্জা করে কেন? কদিন হয় মা নিয়ম করেছে ন্যাংটা হয়ে শুতে হবে। কাপড় পরে শুলে ঘামে আর মাটির ঘসায় কাপড় নাকি সহজে ছিঁড়ে যায়। ন্যাংটা হয়ে শুতে আমিনা যে খুব একটা অস্বস্তি অনুভব করে তা নয়, কেমন ঘুম থেকে উঠলেই ওর প্রথম মনে হয় ও যেন নেই। দুহাত দিয়ে খুঁজে হাতড়ে নিজেকে বের করে নিতে হয়— এই যা!

কিন্তু কাল রাতে এমন আর হবে না। ফজরের নামাজের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বাবা তাঁর খোদা সাক্ষী রেখে কসম কেটেছে কাপড় আনবে। গালি-গালাজ তার বাবা প্রায় সর্বক্ষণই করে। কিন্তু কসম খুব কম কাটে। যদি কখন কাটেও তখন সেটা পালন করবেই, দরকার হলে গলা কেটেও। বাবার যেমনি শরীর মনটাও তেমনি পাহাড়। আমিনা এসব ভাল করেই লক্ষ করেছে। তাই আমিনা আজ জনহীন অন্ধকার ঘন নারিকেল সুপারির বাগানে, উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে তৃপ্তির হাসি হাসছে। কাল ভোরে সে নতুন কাপড় পরবে। দুপুর বেলায় পানি আনতে যাবার সময় বাধ্য হয়ে তাকে কাল আর কখনো যেখানে-সেখানে গা উদোল রাখতে হবে না। ঘুম থেকে উঠেই কাল আর নিজেকে খুঁজে বেড়াতে হবে না। কাল যদি এমনি রাতে সে বাগানে বেরোয় তখন তাকে গাছের পাতার শব্দে চমকে উঠে দুহাত দিয়ে বুক ঢাকতে হবে না— দুটা সুপারিগাছ জড়িয়ে ধরে আমিনা খুশিতে দুলতে থাকে।

পড়তে-পড়তে আমিনা কোনোরকমে সামলে নেয়। খেয়ালই নেই কখন সে ছাড়া পুকুরের একদম পাড়ের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। নিচে ঢালু পাড়ের ওপর বসে বোধ হয় দুটো লোক। অনেক দিনের পুরানো প্রবৃত্তির আদেশে পাড়ের নারকেল গোড়ার ঝোপ-জঙ্গলে চট করে আমিনা প্রায় তার সবটা দেহ আড়াল করে নিল। তারপর সেখান থেকে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল নিচে যেখানে একটা কুপি মাছের ডুলোর মধ্যে জ্বলছে। লোক দুটাকে ঠিক চেনা যায় না। মাছের ডুলোর ফাঁক দিয়ে বেরুনো আলো সাদাকালোয় খোপখোপ দামী তাঁতের কাপড়ের মতো, লোক দুটার ওপর যেন বিছিয়ে আছে। আমিনা ভাবছে কাল ভোবে বাবা তার যদি অমনি সাদা-কালো ঘর ঘর তাঁতের শাড়িই নিয়ে আসে, কী মজাই না হবে।

এখানেই ত থাকার কথা, নেই কেন? মাছের ডুলার লণ্ঠন দিয়ে মকু ডুরে কাটা অন্ধকারে ওস্তাদ হোক্কা ভাইকে খুঁজছে। চাপা গলায় আর একবার নাম ধরে ডাকল। শব্দের রেশ অন্ধকার ঝোপজঙ্গলে মিলিয়ে যাবার আগে পাল্টা একটা ধমক এল : 'ছিল্ল্যাস ক্যা, ইঁয়ানোই ত ব্যই রইছি। নওয়াব এতক্ষণে আইছেন, আর এ মুই হালম রাইত ভরি মশায় হোনমারি শেষ করে দিল আঁরে।'

মকু আলো উঁচিয়ে দেখল নারকেল গোড়ায় ঝোপের ওপর হোক্কাভাইর চোখ দুটো শুধু জ্বলছে। মকু জানে তার দেরী হয় নি, তবু হোক্কাভাইর মুখের ওপর কথা বলা তার সাহসের বাইরে। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। হোক্কা আবার প্রশ্ন করল, 'ব্যাও হাইছত নি?'

'হাইছি।'

'কোঁগা? দেঁয়াছেন?'

ঝোপের ভেতর থেকে একটা বলিষ্ঠ রোমশ হাত বেরিয়ে এসে ব্যাঙ-এর পুটলিটা পরীক্ষা করে নিল। তারপর এক দৃষ্টিতে মকুকে চোখ দিয়ে ছাঁকতে-ছাঁকতে ব্যঙ্গ করে উঠল, 'আরমজাদ মাছ মাইত্য আইছে না বিয়া কইত্য আইছে য্যান। বংছইংগা গামছা মারি এ ন্যা আইছে।'

সে চোখের সামনে মকু অস্বস্তি অনুভব করে। ইচ্ছে হলো একবাব বলে যে এ গামছা ছাড়া বাকি লুঙ্গি যেটা আছে সেটা নেহায়েৎই ছেঁড়া। এ গামছা সে সখ করে পরে নি। পরেছে বাধ্য হয়ে। এটা না পরলে তাকে প্রায় ন্যাংটাই আসতে হত। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পরবর্তী হুকুমের অপেক্ষায়। হুকুম এল— 'যা বাত্তি তলে থুই আয়। এই ছিপও ধর; নিচে রহৈ ইয়ানো আইস আবার।'

সাদায়-কালোয় ঘর কাটা সিল্কের কাপড়ের মতো পাতলা আলোতে মুড়ি দিয়ে দুলতে দুলতে মকু ঢালু পাড় বেয়ে নাবতে লাগল। ফিরে এসে আবার চুপ করে অন্ধকার ঝোপের পাশে দাঁড়াল। ঝোপের ভেতর থেকে দীর্ঘ দেহটা দাঁড় করিয়ে হোক্কা এক হাত দিয়ে মকুর কাঁধ ধরল। গম্ভীর গলায় বলল, 'খুলি হালা।'

মকু বোঝে না।

'গামছা খুলি হালা।'

লোহার মতো শক্ত আঙুলগুলো মকুর নরম মাংসপেশীতে আঁট হয়ে বসে। মকু থতমত খেয়ে গামছাটা খুলতে থাকে। ঝোপ থেকে সম্পূর্ণ বেবিয়ে এসে হোক্কা মকুর পাশে দাঁড়াল। অত্যন্ত নরম গলায় বলল,

'ভালা গামছা নষ্ট করবি কিল্লাই ? আর এই অন্ধকাইর রাইতবে দেইব কাকে ?— হিয়াল্লাই কইলাম আবাই, রাগ করিস নি ত ?'

হোক্কাভাইর এত নরম কণ্ঠ মকু খুব কমই শুনেছে। অবাকও হয়, খুশিও হয়। ঢালু পাড় দিয়ে নাবতে নাবতে আচমকা মকু হোক্কাভাইর দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্ন করে ফেলল। 'আমনে বাড়ির তন ল্যাংডাই আইছেন ?'

নিবিষ্ট মনে কালো নিশ্চল পানি কোথাও নড়ছে কিনা দেখতে-দেখতে হোক্কা বলে, 'উম।'

'দিনের ছিঁড়া লুংগি হেইডা ছরি আইলেন ক্যা ?'

নিজের বলিষ্ঠ উলংগ দেহের দিকে তাকিয়ে হোক্কা উত্তর করল।

'হেইডা তোর ভাবির হিন্দন অন।'

হোক্কাভাই হো হো করে হেসে উঠল। পানির যত কাছে আসছে মাছের যত কাছে আসছে তার হোক্কাভাইর মনে রস যেন তত বাড়ছে। মকু কিন্তু উত্তরহীন।

পাশে বসে থাকতে-থাকতে মকু প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। মজবুত একটা বাঁশের ছিপ বড়শিতে ব্যাঙ গাঁথা। হোক্কা ছিপটাকে ক্রমাগত উঁচু করে ধরে টানছে, একবার ডাইনে আর একবার বামে। আর বড়শীর মাথায় মরা ব্যাঙটা তবতর করে পানির উপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একবার ডাইনে আবার বামে।

সাদায়-কালোয় ছককাটা পাতলা শাড়িতে তাকে মানাবে কেমন— আমিনা শুধু ঐ এক চিন্তাতেই মশগুল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ আলোর শাড়ি যত রকমে পারা যায়, পরে-পরে খুলে আমিনা আবার পরছে।

কী একটা দড়াম শব্দে মকুব তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা বিরাট মাছের আলোড়নে সমস্ত পুকুরের পানি থরথব করে কাঁপছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে মকু হোক্কাভাইর দিকে চেয়ে থাকে। যন্ত্রের কলের মতো ছিপটা নাড়াচ্ছে ডান দিক থেকে বামে আর স্থির পলকবিহীন চোখ ক্ষিপ্ত বেগে লাফিয়ে বেড়ানো মৃত ব্যাঙটাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। লেজের বাড়ি দিয়ে মাছটা একেবারে পানির ওপরে উঠে ব্যাঙটাকে গিলে ফেলতে চায়। কিন্তু বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লেজেব বাড়িতে সমস্ত পুকুব তোলপাড় করে ফেলতে চায় মাছটা। হোক্কা একবার চাপা গলায় বলল : 'শুধু তোব আমিনার ভাইগ ভালারে মকু।' এবং বলা শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে ওস্তাদ হোক্কাভাই গেঁথে ফেলল শৌলমাছটাকে। অল্প কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে হোক্কা মাছটাকে টেনে ডাংগায় তুলে ফেলে নিজের নগ্ন দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে মকুকে বলল : 'দে ছটি দে, নইলে লাফ দি ছলি যাইব, রাইখতাম হাইতাম না! গোটা দুই লাথি আর মাড়ান দিয়ে মকু সেই শেওলা পড়া অতিকায় শৌল মাছটাকে আধমরা করে ফেলল।

হোক্কা কিন্তু ততক্ষণে নির্বিবাদে আবেকটা মবা ব্যাঙ হাতের মুঠোয় পুরে ফু দিয়ে পেট ফুলিয়ে নিল। গেঁথে আবার ফেলল আগেব মতন। দেরি করলে চলবে না। এর জুড়িটাকে ধরতে হবে ত।

ফুর্তিতে দৌড়ে মকু ওপরে উঠছিল মাছটা দুহাতে ধরে। নাবকেল গোড়ার ঝোপে মাছটা রেখে আবার ছুটে গিয়ে হোক্কাভাইব পরের শিকাব দেখবে সে। কিন্তু ঝোপের কাছে আসতে না আসতেই কী বকম ভয়ার্ত চিৎকাব শুনে মকু দৌড়ে পাশের নারকেল সুপাবিগাছের আড়ালে নিজেকে লুকুল। গাছের আড়ালে পালাল ঠিক ভয়ে নয়, মকু জ্বিন-পেত্নীকে ভয় করে না, কিন্তু এ যে মেয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর মনে হলো। গলা ঝেড়ে মকু প্রশ্ন করল, কে হিয়ানো ?

খিলখিল করে হেসে মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর হলো— 'ও মা, তুই নি। আঁই মনে কচ্ছিলাম কে— না কে ?'

আমিনা ? মকু ত প্রায খুশিব আতিশয্যে ছুটে বেরিয়েই আসে। সামলে নিয়ে বলল, 'এত রাইতে তুই ইয়াঁনো যে ?'

'এমনে আইছি আবি, তোঁগো মাছ ধরা দেইখতাম।'

আমিনার তখন কেমন ঢঙ কবাব বসে ধরেছে। মকুর একটু খটকা লাগে কিছুক্ষণ আগে যে হোক্কাভাই ত এখানে ছিল। চিৎকার করে ওঠে। 'আমিনা, তুই হালম রাইতই কি ইয়াঁনো আছিলি নি ? কতক্ষণে আইছিস তুই ?'

প্রশ্নের শেষটুকু অত জোবে কেন বলা হলো আমিনা তার অর্থ খুঁজে পায় না।

উত্তব দিল, 'দুব, হালম রাইত আইব ক্যা ? আঁইত হবে এনা আইলাম।'

মকুর নিজেব সন্দেহে নিজেই লজ্জিত হয়, বোকাই বা সে কিছু কম নাকি ? সারা রাত ওখানে থাকলে নিচ থেকে আসবার সময় মকুকে দেখে বুঝি ভয়ে প্রশ্ন করে উঠত ? মকু গুণগুণ করে, 'তোবল মাছ পাইছি। দেখছত নি আমু ?' আমিনাও কেমন স্বপ্নে রানী হয়ে ওঠে, আলোর শাড়িতে দেহ মুড়ে মকুকে সে সরাসরি দাওয়াত করেই বসে। 'দেখছি। কাইল আইও আঁগো ইয়ানো তোগো মাছ খাইবা, ক্যান ? হোক্কাভাইরেও লই আইও— এ্যা।' আমিনার উদারতায় মকুও গর্ব অনুভব না করে পারে না।

নিচে হোক্কাভাইর ছিপের নিচে জুড়ি শৌলমাছটা পানি আবার তোলপাড় কবে তুলেছে। হোক্কার পাকা হাতের টানে মরা ব্যাঙটা জীবন্ত ব্যাঙ-এর চেয়ে নিপুণতাব সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে শৌলমাছটাকে ফাঁকি দিচ্ছে আর খেঁপিয়ে তুলছে।

দুহাত দিয়ে অত বড় শৌলমাছটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আমিনা ছুটে ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ছি ছি কী লজ্জার কথা! লক্ষ্যই করে নি, কী কবে আঁধার পাতলা হয়ে আসছিল। অন্ধকার যেন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বাগানের মধ্যে এখনও অবশ্য অল্প আঁধার তেমন জমাট কিন্তু ভাঙতে আর কতক্ষণ বাকি। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর থেকে চিৎকার শুনে কাপড় না নিয়েই ছুটে এল মা। তারপর মেয়ের ভয়ার্ত চোখ অনুসরণ করে উঠোনের কোণেব দিকে চোখ পড়তেই থ বনে গেল।

মা আর মেয়ে দেখল, আমিনার বাপ তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। সোবেহ সাদেকের সময় খোদা সাক্ষী রেখে আমিনার বাপ যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা রক্ষা করেনি।

ঐ ত সামনেই আমিনার বাপের ন্যাংটা উরু, তারও পরের দেহটাও উলংগ সামনের মাদার গাছের বড় ডালটা থেকে ঝুলছে। গলায় শুধু বাঁধা আমিনার বাপের শেষ সম্বল কাপড়েব টুকরো, তার পুরানো গামছাটা!

খড়ম

মসজিদের সামনে একজোড়া খড়ম। রাত্রির অন্ধকারে এশারের নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে। সবার শেষে গেছে পরহেজগার ফজু বেপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তারই। সারাদিন অন্ধকারে একবার মাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু বেপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করার সময় পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানের মণ কিনে সোয়া চার টাকা দরে বিক্রি করেও নেক বখ্‌ত আলেম ফজু বেপারীর মণ-প্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণত রহস্যের সমাধান অসম্ভব। এমনকি গ্রামের মাতব্বররাও কোনোদিন এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হয় নি। খোদার যে প্রিয় বান্দা খোদার হেকমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পারে। গ্রামবাসীরাও তাই বিশ্বাস করতো। যার শরীর পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে, খোদা তার উন্নতি না করেই পারেন না। সমস্ত দিনের মধ্যে সব সময়ে পাক থাকতেও তারা দেখেছে ঐ একমাত্র ফজু ব্যাপারীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকির ওপর, সারাটা দিনই ত ফজু বেপারী ওখানে বসে থাকে। অথচ অজু নাই, এমন কথা কোনও ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিও বা এক-আধবার পায়খানা পেচ্ছাব করার জন্য তাকে উঠতে হয় তবুও আবার দোকানে এসে বসবার আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রঙের পরিচ্ছন্ন খালি পায়ে ফরসা লুংগি পরে, মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপি পরে হ্যাঁচকা একটানে তুলে ধরে দাঁড়িপাল্লা। হাঁ করে ক্রেতার দল কী করে আর পালাক্রমে এক হাতের পাল্লা টানে পাল্লাটা উঠে যাচ্ছে, একদিকে আধমণি বাটখারা অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান একটুও হাত কাঁপছে না, নড়ছে না, সাধা দাড়িগুলো কেঁপে উঠছে, কাঁধে পিছের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়। পেছনের সুসজ্জিত চালের বস্তা খয়েরি পাহাড়ের মতো। পঞ্চাশ বছরের অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক নেক লোকই এ শক্তির অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই ধানের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তির আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও ফজু বেপারীকে সন্দেহ করার মতো পাপচিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয় নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের ঠিক পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখবার অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগে নি। আর যদিই বা সে মাপে কম ধরা পড়ত তখন ওরা হয়তো নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করত কিন্তু ফজু বেপারীকে...?

হাটখোলার মধ্যিখানে বিরাট এক বটগাছ। কচি সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা ঠাণ্ডা আঁটালে মাটিতে গত দিনের হাটের ভাঙা ঘড়ের হাঁড়ির টুকরো, ব্যাপারীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা এমনি আরো কত ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে। সূর্য তখনো পুরোপুরি ওঠে নি। মতি ডাক্তারের ডিসপেন্সারির দরজা বন্ধ। উল্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বশিরুল্লাহ কারী শুধু তার দোকানের সামনের জায়গাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরের ঝাঁপি তুলে সুপুরিগাছের তক্তার মাচায় বসে সুর করে কোরান শরীফ পড়ছে। পাকা টেফলের গোটা খেয়ে বট ঘুঘুর ঝাঁক

তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোতে ওদের নরম পাখা তেতে ওঠে। পত্‌পত্‌ করে হলুদ মাখানো ছাইরঙা পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের ওপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপার থেকে ফজু বেপারী আসছে। পুলের মধ্যিখানে একবার থেমে নিয়মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেটগা আইলি আইজ ?'

'অ্যঅন্‌তাই ছোটগা।'

পুলের নিচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার ওপর লুঙ্গি জড়ান। উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ, নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দুহাত দিয়ে কাঁটা ঝোপ সরিয়ে একটা কাঁশের 'আন্তা' তুলছে। আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা এ পুষ্টি চিংড়িমাছ-শেওলাপড়া ছপ্‌ছপ্‌ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও বরাত ফেরে। বাকি আন্তাটা দেখে ঠিক করে কালা লুঙ্গি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আটটা চিংড়ি হয়েছে। কিন্তু শুধু চিংড়িমাছ দিয়ে কী হবে ? অসুখে পড়া মেয়েটা কী খাবে ? আগুনে পুড়িয়ে মরিচ দিয়ে সে নিজে না হয় একবেলা চালিয়ে দেবে। কিন্তু মেয়েটা ? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃতপ্রায় লম্বা ঠ্যাঙের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোস্ত কেটে বসিয়ে দেয়। মেয়েটার ক্ষুধার চিৎকার ভোর রাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। বৌকে তাই লাথি মেরে সে ঘর থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়েই মনে হয়েছে লাথিটা তার নিজের গায়ে মারা উচিত ছিল। বুকে দুধ থাকলে মেয়েটাকে খাওয়াতে পারে আরফানি, কিন্তু না থাকলে ? মায়ের গোস্ত মেয়ে খেলে, বোধ হয় তাও পারত। কালা শিউরে ওঠে। আরফানির বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর চারেক হবে। কিন্তু ওর বুকের দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই ফেটে ওঠে। কেমন যেন বাদুরের মতো কুকড়ে চেপ্টে আছে।

'বেগগুন কি ইছা নি রে ?'

ডিস্‌পেনসারি থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল রোজকার মতো ভয়ে ভয়ে। মতি ডাক্তার কী বলবে তা সে জানত, শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। চিংড়িমাছ নাকি পানির পোকা, ওতে রক্ত নেই। চিংড়িমাছ ক্রমাগত বেশি খেলে নাকি রক্ত সাদা হয়ে যায়— কিন্তু তোর ঐ 'আন্তার', এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আর কিছুই ওঠে না। সে কী করবে ?

'কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুনাইন মিকচার দিলাম হেইডার টেয়সা কিরে কালা ?

বলতে-বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খলুই থেকে গোটা চারেক বাছাই করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ করে বলতে থাকে,

'একছার গুড়াগুড়া এ না। তাথা কাইল আরও চাইগা দিস। হেইলেই সারব।' বলে ডিসপেনসারির মধ্যে পা বাড়ায়। কালা কোনোরকমে উচ্চারণে করে।

'ডাগদর সাব আঁর মাইয়া বঁনাইবেত ?'

ডাক্তার মুখ খিচিয়ে ওঠে 'বাঁইচতন ক্যা ? বাঁইবে খোদা বাছাইলে বাঁইচতনা ক্যা ?'

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

'হাক করি চাই রইছত ক্যা ? খাওয়া, খাওয়া, খাওয়ালেই মানুষ বাঁছে বুঝ্যত ? তোর মাইয়া বাইছব।'

কালার কান দুটা ঝাঝা করে ওঠে। সে টলতে-টলতে সরে যায়। ডাক্তার তখনও গড়গড় করছে।

'বাঁইচ্চত ন্যা ক্যা বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুনাইনের পানি, আর ইছার গুঁড়া খাই বাঁছে না।'

দুহাত দিয়ে কালা কান চেপে ধরে। শেষেরটুক সে শুনতে চায় না, নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখ থেকে সে কথা শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছে হয় অমন কথা বলবার আগে বাকি চিংড়ি কটাও ছুঁড়ে মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে, সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ! যা খেলে মানুষ বাঁচে। রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠলো। কেরোসিন টিনের দোকানের কাল বেড়াব ওপর সাদা চুন দিয়ে লেখা এখানে মওতের কাপড় বিক্রয় হয়। ছোট কালের কারীর পাঠশালায় লেখা বিদ্যার ওপরও যথেষ্ট নির্ভর করতে পারে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মওতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড় কবর দেবার আগে সে কাপড় ভেতর থেকে দেখতে যেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে— 'তোর মাইয়া ভালা নি রে আইজ ? চাই রইস ক্যা, লাগব নিরে কোন তা ?'

'না, না', কালা কোন রকমে চিৎকার করে ওঠে।

'আইন্যেগো দোয়া, আইন্যেগো দোয়া', বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেরিয়ে যায়। যাদের স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পরনের কাপড় পরিষ্কার, যাদেব দেহ অজুতে পাক তাদের কাছ থেকে কালা পালিযে বাঁচতে চায়। ফজু ব্যাপারীর মুখে তার মেয়ের অসুখের খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিয়ে আজ সে বাড়ি ফিরবে না।— এ সমস্যাব সমাধান হলো মুন্সি বাড়ির বৈঠকখানার দুকানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোরাকি ছাড়া। কালা রাজি।

সকাল গড়িয়ে দুপুরের রোদ মাথার উপর তেড়ে উঠে। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা আগাছা উপড়ে চলেছে। রোদে পুড়ে পেটের চামড়া চড়চড় করছে। হাতের টানের এক আধফোটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শির শির করে ওঠে। মনে হয় যেন জ্বর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে। দুদিনের অভুক্ত পেট দু'রাত চালের দুস্বপ্ন দেখা চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। কাঁচা ধানের সবুজ আর ঘাষের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট করে যায়। ঘাস টানতে ধানের গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপি কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, চোখ মেলে দেখে সামনের সীমাহীন বাকি জমিটুকু। সবুজ জল-ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন ? জুম্মার নামাজ তো সে কখনো বাদ দেয় নি। আজ সে নামাজ পড়বে। আজ তার জীবনের উৎসব। আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে। দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায় বাড়তি লুঙ্গি তার শেষ হয়েছে যে দিন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা পাঁচশ টাকায় আর ভবিষ্যতের অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরনে লুঙ্গিটা আজ পরছে একাধারে সপ্তাতিনেক ধরে, লুঙ্গি পাক থাকবে কোত্থেকে। সে তো আর ফেরেস্তা নয় ? আর বৌর সঙ্গে সেত আর ল্যাংটা হয়ে সংসার করতে পারে না! সে বোজ ভোরে গোছল সেরে, পাক লুঙ্গি পরে সে ঘর থকে বেরুবে ? হাসতে হাসতে ওর মুখ নীল হয়ে ওঠে। আরো কালো হয়ে ওঠে

যখন আবার বিস্ময়ে ও দেখতে পেল তার বৌ আরফানি চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পেছনে ছুটতে ছুটতে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের আরো দুচারজন গণ্যমান্য লোক। আরফানির কাপড়ে বাঁধনে না আছে ইজ্জত, না আছে আব্রু। কালা মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হাহা করে, আরফানির রুক্ষ চুল কান-ফাটা আর্তনাদ করে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিনচার ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনিন মিক্‌চারে বেঁচে থেকে এই ভোর বেলা কালার মেয়েটা ফট্ করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালা গুম হয়ে বসে আছে। দুহাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জোঁক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পেট ফুলে উলটে পড়ে আছে। সেই একটুখানি ক্ষীণ রক্তস্রোতের চারপাশের চামড়া পড়া পানিতে ভিজে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানি থেকে থেকে গোংগর—'আঁই ভাত খাইয়ুম, আঁই মইরত্তামন, আই মইত্যামন, আঁই ভাত খাইয়ুম!'

কালা পা-টা একবার নাড়ে, দেখে নড়ে কিনা, লাথি মারবাব জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারী দয়া করে সব করে গেছে। আর নিজ দোকান থেকে কাফনের কাপড়টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবার সময় শুধু আরফানিকে বলে গেছে কাফনের কাপড় বাকি রাখা গুনাহ। ওতে মুর্দার রুহ্ কষ্ট পায়। কাফনের বাবদ বাকি তিন টাকা যেন তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানি আবার কাতরাচ্ছে—

'আঁই মইত্তামন। আঁই মইল্লে আঁরও কাফনের কাপড়ের দাম বাকি থাইকব। আঁই... ...'

কালার পা-মাথা সব ভারি হয়ে আসছে, কিছুই আর নড়তে চায় না। কানের কাছে আরফানির অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোনোরকমে দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়ার অবধি আসে, তারপর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার পথ হাতড়ে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে কালা চলতে শুরু করে দেয়। দুচোখ আঁঠাল হয়ে বুঁজে আসে একটা অদ্ভুত ক্লান্ত শ্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাঁট লেগে যখন চোখ মেলল তখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার। খালপাড়ের মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে। চারদিকে ঝিঁঝি ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা মনে করতে পারল। হাত-পা সব ব্যথায় টনটন করছে।

মসজিদের কাছে এসে হঠাৎ কী মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তার আর মাটির সিঁড়ির সামনে। এশারের নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে। সকলে চলে গেছে। সামনের সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শক্ত। বড়। ফজু ব্যাপারীর কনিষ্ঠ পায়ের দাগ মস্। কাঠের ওপর আরও কাল হয়ে ছাপ পড়েছে। পাটা আর চামড়ার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের কথকে আঙ্গুলগুলো স্পষ্ট গোনা যায়। গুনতে গুনতে কালা মাঝির চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, বিড়বিড় করে ওঠে : 'আই মইত্তামন, আই মইত্তামন।'

নিঝুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে-টিপে কালা মাঝি ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানে পেছনের বেড়া ঘেঁসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত। সড়াৎ করে হাতটা সে সরিয়ে নিল। ভেতরে যেন কারা আছে। কারা যেন নড়ছে। কালা কান ঝেড়ে টিনের সাথে চেপে ধরে। ধানের রোঁয়া রোঁয়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ুকে বিবশ করে দিচ্ছে। আর ভেতর থেকে অস্পষ্ট দ্রুত নিঃশ্বাস স্পন্দিত শব্দ

'আহ। কবস কী ? এমুটে সরি আয়। কাফনের উপর হুচ্ছ্যত ক্যা ? এমুট কাইত্যই আয়।'

খিলখিল কবে একটা মেয়ে হেসে ওঠে।

'কাফনের কাপড় হি হি হি হি-বাঃ হেমুই যে আবার তর ছাইলের বস্তা। আঁই ইয়ানোই হুতুইম— ছাইলেব বস্তাব লগে ঠেস দিলে আর ডর কইওনা— হিহি হিহি—'

আবফানির বিকৃত হাসিব কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে ওঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসাব তপ্ত প্রশ্বাস।

পবেব দিন ভোর বেলায় বট ঘুঘুর ঝাঁক যখন রোদের আঁচ পাওয়া মাত্র উড়ে চলে গেছে। যখন সদ্যস্নাত শান্ত-সৌম্য ফজু ব্যাপারী তাব দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীবে এসে দাঁড়াল কালু মাঝি। কোমর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল— 'কাফনের বাকি দিতা আইলা বুঝি বাবা।'

'জি।'

'আব কী দিযুম, কিছু চাইল ?'

'না। বাকি টাঁদিও কাফনেব কাপড় দেন।'

আঁতকে উঠলো ফজু ব্যাপাবি।

'কাফনেব কাপড় ? কাব লাই ?'

'আবফানিব লাই।'

চমকে উঠছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু কবে। সাদা কাপড় প্রমাণ মাপেব স্ত্রী মুর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবাব জন্যে যতখানি দরকার।

শবেবরাত

আশরাফ অ্যারিস্টোফেনের "ফ্রগস্" পড়ছিল।

হঠাৎ নীল পর্দার মেঘ সরিয়ে ঘরে ঢুকল ভাবি। আশরাফকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলল। তারপর সুডৌল বাহুর মৃদু আকর্ষণে দিল তাকে দাঁড় করিয়ে। হাতের বইটা কোলাব্যাঙের মতো খপ্ করে চেপ্টে পড়ে রইল সোফার ওপর।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে আশরাফ জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কী ?

ভাবি নির্বাক। ধীরে ধীরে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে প্রথমে একটা পাউডার পাফ বের করল। সেটা দিয়ে আশরাফের মুখে দুটো মৃদু আঁচড় দিয়ে, হাতে নিল একটা ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম চিরুনি। তারপর তার রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলোকে আঁচড়ে, টিপে ওকে যেন একটু ভদ্রগোছের করে তুলবার চেষ্টা চলল কিছুক্ষণ, এ অসহ্য পরিক্রিয়ার অত্যাচারে ওর মনটা খিঁচড়ে গেল। মাথার তন্ত্রীর মাঝে তখনো ওব তাজা ইউরিপাউড্স্-স্কাইলাসের যুদ্ধংদেহী মূর্তি। ভাবি কিন্তু এদিকে নীরবে ওর মুখের অংশে সভ্যসমাজের যতখানি মাখামাখি চলে করল। তারপর নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে আলনা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সেখান থেকে আশরাফেরই শেরওয়ানি আর পায়জামা তুলে নিয়ে ওব অসাড় হাতে গুঁজে দিল— চট্ করে লক্ষ্মী ছেলের মতন এগুলো পরে নাও তো— আমি এখুনি আসছি।

বিরক্তিতে আশরাফ তখন প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। বাধা দিয়ে বলল, মতলবটা কী বল তো ?

তোমায় একটু সভ্যতরো করে তোলা।

ঠাট্টা রাখো, এ আমি পছন্দ করি না। দেখলে পড়ছিলাম, তবুও খামোকা খানিকটা মেয়েলী রসিকতা করে দিলে সমস্ত আবেস্টনীটাকে পণ্ড করে।

বিকেল ছ'টা কখনো পড়াশুনোর সময় নয়।

মাঠে গিয়ে বলিবর্দের মতো দৌড়ুতে বল, না ?

ঠিক মাঠ নয় তবে নদীর পাড় অবধি নিশ্চয়। হ্যাঁ দৌড়দৌড়ি অবশ্য নয়, শুধু কিছুক্ষণ মার্জিত পায়চারি। আর মাঝে মাঝে আমাদের মতো সুযৌবনের দর্শন পেলে নিষ্পলক নেত্রে ফ্যাল্ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে জন্ম সার্থক করবি। খোট্টার দেশে তো আর তোদের সে সৌভাগ্য কখনো হয় না।

ড্যাম্ ভাঙ্গা হাসির তোড়ে ভাবিব সুগঠিত দেহ এত বেশি ফুলে ফুলে দুলে উঠল যে অল্প সময়ের জন্য কথার দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর একটু সাম্লে নিয়ে বলল, সত্যি আশি, তুই হলি কী ? পরীক্ষা তো এখনো অনেক দেরি, তবু কেন ঐসব পুরনো বইর কালো কালো অক্ষরগুলোকে তোর রক্তকে অমন করে শুঁষতে দিস্ ? চশমার কাচ দু' ইঞ্চিতে ঠেক্ল, বুকের মাপ উনত্রিশ ইঞ্চিতে পৌঁছল বলে— তবুও তুই যে কী ছাই-ভস্ম তৃপ্তি পাস্ ঐ বইগুলোব ভেতর। আর পড়িসই বা তুই কী করতে, স্মরণশক্তি বলেও কি তোর কিছু আছে নাকি ?

এবার আশরাফ সত্যিই ঘাবড়ে গেল। ওর মনে হলো, তাই তো কয়েকদিন ধরে কেমন যেন একটা ডাল-মেমোরি মতন অনুভব করছিল ও। তাহলে কি আলিগড়ে ভেড়ার গোস্ত খেতে খেতে স্মরণশক্তির কোষটায় চর্বি জমে গেছে? নাহ্, বিএ পাশ করার পর জায়গাটা ও ছেড়েই দেবে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, আমার স্মরণশক্তি যে দুর্বল তার প্রমাণ তুমি কী করে পেলে?

বাহ্ কাল যে দিব্যি কথা দিয়েছিলি আমাকে নিয়ে তুই স্টিমার ঘাটে যাবি!

কেন ইলোপ করতে?

বে-তমিজ! এও মনে নেই যে তোর খালাম্মা তারা আজ আসছেন?

না হেসে আশরাফ আর পারে না। ছি ছি! কী পাগলামী! খালাম্মা তারা যে আজ আসবেন একথা মনে নেই বলেই নাকি তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হয়ে গেল যে তার স্মরণশক্তি অস্বাভাবিক রকম দুর্বল! আর তাই অডিপাস্-আগামেম্নন নিয়ে নাড়াচাড়া করা তার পক্ষে কেবলমাত্র নির্বুদ্ধিতার পরিচয়! এমন সময়ে আশরাফের সাত বছরের বোন টুনী ফ্রক্ জুতো ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় ঘরে ঢুকে হঠাৎ আশরাফকে দেখেই একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। তারপর রীতিমতো বৃদ্ধা অভিভাবিকার মতো সোফায় ঝপ্ করে বসে পড়ে দু'গালে হাত দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ উচ্চারণ করল—ওমা! আশি ভাই এখন পর্যন্ত তুমি কাপড়ও পরোনি?

আশরাফের মনে হলো সে যেন এতক্ষণ উলঙ্গ হয়ে বসে ছিল। আর টিকতে পারল না। গ্রিক্ নাট্যকারের সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে ওকে উঠতেই হলো।

বারান্দায় আসতেই একটা বিশ্রী ভুরভুরে গন্ধ নাকে গেল। ওপরের দিকে চেয়ে আশরাফ বুঝল গন্ধ আসছে পাকের ঘর থেকে। আম্মাজান বোধহয় তাঁর আগতপ্রায় বোনের জন্যই এ অসময়েও পাকের ঘরের গরম আঁচে ঘেমে উঠেছেন। আশরাফের নাকটা কুঁচকে ওঠে। কী কুচ্ছিৎ কটা গন্ধ— দারুচিনি, আর ঘিয়ে ভাজা পেঁয়াজ আর পেস্তা, বাদাম।

সব্বাই এসে গাড়িতে ওঠে। আশরাফ এসে স্টিয়ারিংটা আল-গোছে ধরে বসল। আরেকবার নাকটা সিটকালো। নাহ্ পাকঘরটা কী ন্যুইসেন্স! পুরনো প্যাটার্নের ব্যুইক্ গাড়িটা যেন একটু বেগেই ঘর্‌ঘর্ করতে লাগল। ক্লাচ টেপা অবস্থাতেই এ্যাক্সিলেটরে জোরে চাপ দিল আশরাফ। খানিকটা পোড়া স্পিরিট আর মোবিলের গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আশরাফ। আহ্— যাক এতক্ষণে তবুও ঐ নোংরা পাকের ঘরের স্মৃতি থেকে বাঁচা গেল।

দূরে ঢাকা মেলের বাঁশি কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে।

জর্ডন কোয়ার্টার পেরিয়ে ওরাও তখন স্টিমারঘাটে প্রায় পৌঁছল বলে।

স্টিমার এল।

কড়া এসেন্সের গন্ধ পেয়ে আশরাফ চোখ তুলতেই দেখে ভাবি তার রুমাল নাড়ছে। প্রথম শ্রেণীর রেলিং ঘেঁষে আক্রামভাইও স্মিতমুখে ভাবিকে সংবর্ধনা জানাচ্ছে। ওহ্ ভাবির অত্যধিক আগ্রহের একটা হদিস তবু এতক্ষণে পাওয়া গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওরা নেমে আসছে।

কিন্তু আক্রাম ভাইর পাশে ওটা কে? সাহানু— সাহী? মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত শীর্ণ হয়ে নেমেছে সিল্কের বোরখাটা তারপর হঠাৎ কুচি দিয়ে ফুলে উঠেছে পা অবধি। বিসর্পিল সে ঢেউ খেলানো সীমারেখার নিচে, স্বচ্ছ ভেনিসিয়ান স্যান্ডেলে জড়ানো শুভ্র একবিন্দু তুলতুলে

পা। মাংস আর সিল্কে মিলে হেলেনের প্রশ্নবোধক চিহ্নটা তীক্ষ্ণ বর্শার মতো এসে বিদ্ধ হলো ক্ষতাক্ত হৃৎপিণ্ডে। সুপ্তোত্থিত দানবের মতো গৃধিনী উচ্চে হাই তুলল হাংগ্রিল ক্ষুধা!

ভাবি একটা আঙুলে গুঁতো দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ভাবছিস উডস্টেডের স্ট্রাইপ দেয়া সুট্‌টা পরে এলেই ভালো করতি না ?

রক্তিম হয়ে ভীরুকণ্ঠে শোধরাবার চেষ্টায় আশরাফ বলল, কী যে বল— তিন বছর পরে দেখছি, তাও একটু উদগ্রীব হব না ? তোমার পাপ মন কিনা তাই ওসব ভাব!

বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বলতে হবে না। মুচকি হাসিতে লতিয়ে উঠল ভাবি।

সকাল আট-টা।

নিট্‌শির কবিতায় দর্শনবাদ খুঁজতে খুঁজতে আশরাফ চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। পর্দার ওপাশ থেকে স্যান্ডেলের আওয়াজ ভেসে এল। আশরাফ বুঝল ভাবি চা নিয়ে আসছেন। আরো গম্ভীর হয়ে ও পড়তে থাকে। পায়ের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে আসে, একেবারে ওর চেয়ারের পেছন অবধি। আশরাফ তবু নির্লিপ্তভাবে পড়েই চলেছে।

দেরি করার জন্য ক্ষমা চাইছি, কণ্ঠস্বর সাহানুর!

চমকে উঠে চোখ ঘুরিয়ে ও দেখে চায়ের ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে সাহানু। অত্যধিক সহজ সচল হবার চেষ্টায় আশরাফ প্রশ্ন করল, তা ভাবি আসলেন না কেন ?

আম্মা চায়ের টেবিল থেকে ওনায় ছাড়লেন না, তাই ভাবির অনুরোধে আমাকেই নিয়ে আসতে হলো।

বলতে বলতে ও টি-পটটা টেনে নিয়ে চা বানাতে শুরু করে। একটু থেমে —এ কিন্তু আপনার অন্যায় আব্দার, সকলের সঙ্গে বসে চা-ও খাবেন না, আবার চাকর-বাকরে বানিয়ে দিলে সেটাও ছোঁবেন না!

আশরাফের দিকে এক পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে ও নিজেও বসে পড়ল পাশের সোফায়।

আশরাফ চোখ থেকে এবার শেলের চশমাটা খুলে ফেলে। চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে সাহানুর মুখোমুখি হয়ে বসে। জার্মান দর্শনবাদের গুরুগম্ভীর গৈরিক আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে ও উত্তর দেয়।

দেখ, আর সব ব্যাপারে আমি অভদ্র, অসামাজিক থেকে আরম্ভ করে অমানুষিক অবধি হতে পারি, কিন্তু চা খাওয়ার বেলায় আমি খাস জাত অভিজাত। আমার কাছে চা'টা শুধু এক পেয়ালা রঙিন গরম পানি নয়, তাতেই চায়ের ডেফিনিশন পূর্ণ হলো না। তাকে ঘিরে থাকা চাই একটা নরম, নবনীয়, রুচিসম্পন্ন আবেষ্টনী। তাই যে পেয়ালায় আমি চা খাব তাতে থাকা চাই উড়ন্ত চীনে হাঁস আঁকা, যে হাত সে চা ধরবে তাতে থাকা চাই একটা পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা।

বুঝলাম! আপনি যে সাজিয়ে কথা বলতে সিদ্ধহস্ত সে কথা বুঝলাম। বলে সাহানু পিছলে পড়া শাড়ির প্রান্তটুকু কাঁধের ওপর গুছিয়ে নিতে থাকে।

হাঁ করে দেখছিস কী, চা খা না কেন ? বলতে বলতে ওর খোশবুদার ভাবি প্রবেশ করল সশব্দে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে আশরাফ অনাবশ্যক তাড়াতাড়িতে গরম চা ঠোঁটে ঠেকাতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলল জিভ। ছলকে-পড়া কিছু চা নষ্ট করে দিল ওর সাদা পাঞ্জাবির ক্ষুদ্র একটা অংশ। তারপরই এই হাস্যকর পরিস্থিতি থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়ার জন্য

অধিকতর বোকার মতো বলে ফেলল, বাহ্ এত গরম চা কী করে খাই ?

ভাবি হেসে উঠল প্রচণ্ড ধ্বনিতে।

সাহানুর টোল খাওয়া গালে কে যেন আবীর ছিটিয়ে দিয়েছে তখন। হাসির আবর্তেব মাঝে তবু কেন জানি থেকে থেকে জেগে উঠছিল লজ্জাব এক আধটা আড়ষ্ট ইঙ্গিত।

কিছু হয়নি, তবু ওরা যখন ঘব থেকে বেরিয়ে গেল তখন আশরাফেব ভীষণ অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। ওর মনে হতে থাকে ভাবিব ঐ দোলাযিত হংসগ্রীবার প্রতিটা ভাঁজে কী একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা ওকে ব্যঙ্গ করে চলে গেল। ভাবির ঐ বাঁ কানের চমকানো হীবের দুলটা যাবার সময যেন ওর দিকে ঝিকমিক কবে হেসে বলল—অত্যন্ত দুঃখিত, তোমাদেব ঐ নির্জন বঁদেভূতে ববাহুত ভূতেব মতো অকস্মাৎ উপস্থিত হবার জন্য আমি লজ্জিত।

পড়তে পড়তে আশরাফ একসময হাতের বইটা ভুলে যায। অন্যমনস্কভাবে ভাবতে আরম্ভ কবে। অদ্ভুত, খাপছাড়া কল্পনাব অজস্র বন্যা এসে অল্প সমযেব মধ্যে ওকে ভাসিযে নিযে যায এ পৃথিবীর অনেক দূবে! ধীবে ধীরে মরক্কো লেদারে বাঁধানো নীল বইটা ক্রমশ অস্পষ্ট হযে আসে— কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে ওর সোনালি নামটা। কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়াব মতো ওব মাঝখান থেকে পেঁচিযে উঠতে থাকে কাবও সিল্ক আচ্ছাদনেব মোলাযেম প্রান্ত, তাব ফুলে ফেঁপে ওঠা মসৃণ খাঁজ। ওব মনেব ঠাণ্ডা গহ্বব থেকে জেগে ওঠে স্যালোম্বোব উষ্ণ দেহেব পূর্ণাঙ্গ সীমাবেখা। অদেহী কোনো কিন্নবীর কোকেনী আলিঙ্গনের মতো সবটা স্বপ্ন ওব সমস্ত তন্ত্রীকে করে তোলে তন্দ্রালু নিস্তেজ হিমেল।

আচমকা আশবাফের ইচ্ছে হয়, চুমু দেবাব সময যদি ও বক্তও চুষতে পাবত। সত্যি আজ ও বুঝতে পারে যে নিবক্ত দেহ ও কোনো দিন ভালোবাসতে পাববে না। অঙ্গ গঠনে বিকৃত থাক আপত্তি নেই কিন্তু কোষে কোষে থাকা চাই উপচে-ওঠা নোনতা বক্ত। চুমু দিতে দিতে ও চুষে খাবে। বিকারগ্রস্তের মতো ও বিড়বিড় কবে ওঠে—খোদা, দাঁত আমাব সাপেব মতো সূচ-ছিদ্র করে দাও, আমি রক্ত চুষব, শুষব।

দবজার কাছে কার পদধ্বনি শোনা যায। সম্বিত পেযে নিজেব কল্পনায আশবাফ নিজেই শিউরে ওঠে।

আসতে পারি কি ? পর্দাটা না সবিয়েই মিহি গলায বাব থেকে কে প্রশ্ন কবল।

নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে এক পেযালা চা আব এক প্লেট বিস্কিট হাতে নিযে ঘবেব ভেতব ঢুকল সাহানু। আশরাফ অনেকটা সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, এই এখন হঠাৎ চা নিযে যে !

তোমার ঘরে অসময়ে আসবার এ ছাড়া আব অন্য কোনো অজুহাতই নাকি চলে না। অবশ্যি ঘুষ দেবাব এ ফন্দিটা ভাবিব কাছে সদ্য শেখা।

চীনে হাঁস আঁকা চায়েব পেযালাব সোনালি বিমে চুমুক দিয়ে আশবাফ আবম্ভ কবে—অর্থাৎ, তোমরা দুজনে মিলে ষড়যন্ত্র কবে আমাব সমস্ত পড়াশুনো একেবারে মাটি করে দিতে চাও, না ?

আশরাফের কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্যেব নিখুঁত আবেষ্টনী। সাহানু হঠাৎ চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে ওর একটা করুণ বক্তিম আভা। মুখে শুধু বলল, বেশ, —তুমি তা হলে পড়ো। সমস্ত বছর ভরে তো আব হাজাব মাইল ছুটে গিযে তোমাব সময নষ্ট কবে, বিবক্ত কবতে যাই না।

এতটুকু বলে সাহানু আর দাঁড়ায় না। দরজার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে।

সাহানু! আশরাফ একটু জোরেই ডাকে। সাহানু কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়েই পর্দাটা ঠেলে ধরেছে বাইরে যাবার জন্য। আশরাফ প্রায় চিৎকার করে উঠল, সাহী !

শিউরে উঠে সাহানু পর্দাটা ছেড়ে দিল। নিজের নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে যে অতটা উদাত্ত কল্লোল ধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে এ কথা ও আগে কোনো দিনই ভাবতে পারেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিচু সুরে শুধু প্রশ্ন করল, কী ?

আশরাফ তখন গাঢ় চোখে সাহানুর দিকে চেয়ে আছে, সাহানুর মুখের পানে। সেখানে এরই মধ্যে দুটো লাস্যময়ী টোল দুলতে দুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। চারপাশে জমে উঠেছে ঘোর রক্তিম আভা। মনে হচ্ছে রক্তের একটা ক্ষ্যাপা ক্ষুদ্র ঘুর্ণি! আশরাফ হেসে উঠল—তুই একটা ছেলেমানুষ, একটুখানি ঠাট্টা করলুম অমনি অত চটে গেলি !

বলে আশরাফ শূন্যপথে আঙুল তুলে রেখাঙ্কিত করে সাহানুর পথ চিহ্ন করে দিল। সেই পথ লক্ষ্য করে সাহানু আবার এসে চেয়ারে বসতে বাধ্য হলো।

চটব না, বাহ্। সব্বাই বারান্দায় বসে গল্প করছিল, হঠাৎ আমার এমনিতেই একটু ইচ্ছে হলো তোমায় দেখতে। উঠে পড়লাম। ভাবলাম অত রাত, একলা বসে বসে অনেকক্ষণ পড়ছো, এক পেয়ালা চা পেলে সত্যিই হয়তো তুমি খুশি হয়ে উঠবে। তারপর তুমিই বলো, প্রতিদানে ঘরে ঢুকেই যে সম্ভাষণটা পেলাম তাতে দুঃখ হওয়া সত্যিই কি বিচিত্র ?

আশরাফ চা শেষ করে নীরবে খালি পেয়ালাটা এগিয়ে দিল সাহানুর দিকে। তারপর উদ্গ্রীব আঁখি মেলে চেয়ে রইল, কী করে সাহানুর খোঁদাই করা হাত বিস্তৃত হয়ে আসে পেয়ালাটা নিতে! আচমকা আশরাফ চেঁচিয়ে উঠল, ও-কী, তোমার হাতে কী হলো ?

আশরাফ ওব হাতটা তুলে নিল ওর নিজের হাতে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল হাতের খোলসের তুলতুলে একটুখানি নরম মাংস। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টায় সাহানু একটু ছট্‌ফট্ কবে উঠল। আহ্ ছেড়ে দাও না, ও কিচ্ছু হয়নি!

কিন্তু রক্ত যে, কাটল কী করে ?

তবু খামাকা তর্ক করছো, বলছি কিচ্ছু হয়নি।

সাহানু কিছুতেই বলবে না কী করে কেটেছে। আশরাফও নাছোড়বান্দা। অতঃপর সাহানু স্বীকার করল যে একটু আগে ক্রিম ক্র্যাকারের টিন খুলতে গিয়ে ঐ ছোট অবহেলীয় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।

আমার জন্য বিস্কিট আনতে গিয়ে তোমার হাত কেটে গেল ? ছি ছি ছি! এখন না আনলে আমার তরফ থেকে কিইবা এমন ক্ষতি হতো ? মাঝখান থেকে খালি খালি তোমার হাতটা অমন করে কেটে অত রক্ত—

থামো না, কী বাজে বকছো!

না, না, বলা যায় না, রক্ত! সে যে ভয়ঙ্কর দামি জিনিস! আর তা ছাড়া তোমার রক্ত, আমার জন্য নষ্ট হবে সে—

শব্দগুলো বরফকুচির মতো জমে উঠল। আশরাফ ততক্ষণে সাহানুর নিটোল হাতটা টেনে তুলে ফেলেছে নিজের চোখ আর নাকের বড্ড কাছে। অস্ফুট আড়ষ্ট কণ্ঠে সাহানুর মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসল—আশি ভাই, ও কী ছেলেমানুষী হচ্ছে ?

আশরাফের চোখের সামনে তখন সাহানু অদৃশ্য, অদৃশ্য হয়ে গেছে 'স্যালাম্বো'র নীল মরক্কো লেদারে বাঁধানো রাজ সংস্করণ। চারদিকে শুধু একটা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হিমেল গভীর গুহা, শব্দহীন স্পন্দনহীন। এর মধ্যেই চারদিক ঝলসে দিয়ে ভেসে উঠল একটা মসৃণ চক্‌চকে মেজার গ্লাস, ফোঁটা ফোঁটা টাটকা তপ্ত রক্ত পড়ে ভরে উঠছে সেটা। আর কে যেন তাতে ঢেলে দিয়েছে দু'এক কণা স্যাকারিনের সোনালি গুঁড়ো। আর নিচু হয়ে আশরাফ সেটা চুষছে, চুষছে, চুষছে।

কেন জানি এরপর দুদিন ধরে সাহানু আর আশরাফের সাথে এক রকম কথাবার্তা হয়নি বললেই চলে। সন্তর্পণে এ ওকে যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলেছে। ভাবি-ই এ দু'দিন আগের মতো চা এনে দিয়েছে। সবই বেশ স্বাভাবিকভাবে চলছিল। ভাবির সামনে আশরাফ তবু চাইত আরো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে। নিজকে সে তার ফলে করে তুলত হাস্যকর, অদ্ভুতভাবে ভীরু ভীরু। আর তাই প্রত্যেকবারই ভাবি যখন নিঃশব্দে চা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেত ওর তখন মনে হতো ভাবি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। ওর চোখ জ্বালা করে উঠ্‌ত ভাবির ঐ বাঁ কানের চমকানো হীরে আর হংস-গ্রীবার ওপর কোঁকড়ানো চুলের ভাঙা অংশগুলোকে কাঁপতে দেখে।

সন্ধ্যার দিকে ভাবি হঠাৎ ওর ঘরে এসে হাজির। হুকুম করল ওদের বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য।

নদীর ধারে শুরকি দেওয়া লালরাস্তা ধরে ওরা তিনজন হাঁটছিল। ভাবি মাঝখানে, আশরাফ আর সাহানু দু'পাশে। নদীর ওপর থেকে ভেসে আসছিল বেশ ঠাণ্ডা একটা বাতাস হু হু করে। সেই শব্দ এসে আবার ঢেউ তুলছিল ঝাউ বনে, একটা একটানা শোঁ শোঁ প্রতিধ্বনিতে।

ভাবি একলাই উৎফুল্ল হবার চেষ্টায় খুব জোর গলাতেই কথা বলছিল অনবরত। মাঝখানে সহজ কণ্ঠে আশরাফ বাধা দিল। ভাবির কথার তর্কে জের টেনে বলল—তবু শেষ অবধি তোমাদের অবস্থা ঐ বাদুড়ের চেয়ে খুব বেশি উন্নত নয়।

অর্থাৎ ?

ভাবির কণ্ঠস্বরে সশব্দমান প্রশ্ন গর্জন। সাহানুর চোখে অবরুদ্ধ আবেগের নিঃশব্দ তর্জন।

কিচ্ছু না।

আশরাফ একবার গলাটা ঝেড়ে আরো ভঙ্গিমা করে : কিচ্ছু না, শুধু এই যে সন্ধ্যা না হলে যেমন তোমরা পথে বেরুতে পার না, ওরাও তার আগে আকাশপথে কিছুতেই বেরুতে সাহস করে না। তবে তফাত এই যে ওরা না দেখে অন্ধ, আর তোমরা দেখেও অন্ধ থাকতে বাধ্য! অবশ্য তোমরা দিনের আলোয় যে একেবারেই বেরুতে পার না তা নয়— তবে বোরখার আঁধার আগে চারধারে সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর। তাই তো তোমাদের মনে আড়ষ্টতা চরণে জড়তা বলনে সঙ্কোচ।

ব্যাস বন্ধ কর। তোর লেকচার এখানে চলবে না, এই আমার অর্ডার।

ভাবি হেসে উঠল।... সাহানু নীরবে হেঁটে চলেছে। সাবুনে আকাশে একটা প্রায় পুরন্ত চাঁদ নদীর পানিকে রুপোলি করে দিতে প্রাণপণ যুজ্‌ছে।

কালকে শবে-বরাত, না ? ভাবি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আর পরশু আমাদের যাবার দিন, সাহানুর উত্তর।

অবশ্য, তার আগে যদি তোমাদের কারো ভয়ঙ্কর একটা অসুখ না হয়ে পড়ে। যা পাতলা একটা ফ্যাশন-দুরস্ত শাড়ি পড়ে এসেছ— নাও, এই চাদরটা জড়িয়ে ধরো।

এবং সাহানু কিছু আপত্তি করবার আগেই আশরাফ নিজের চাদরটা সাহানুর দু'কাঁধের ওপব দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে দিল।

বেড়িয়ে এসে ওরা ড্রইং রুমে বসে। জানালা দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাঁদের আলো এসে ডুবিয়ে দিচ্ছিল সমস্ত ঘরটাকে। ভাবি বসল চাঁদের দিকে মুখ করে। সাহানু অকারণেই চুপ করে গিয়ে বসল একটা অন্ধকার কোনায়। তিনজনই চুপচাপ, হঠাৎ আশরাফ নিজেব অজান্তেই আত্মস্থ হয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে, তার নিজেরই খেয়াল নেই। টেরই পায়নি কখন এরই মধ্যে নিঃশব্দে ভাবি ঘর থেকে চলে গেছে। অজস্র এলোমেলো কল্পনা থেকে যখন বিচ্ছিন্ন করে নিল নিজকে, তখন খালাম্মার সাথে ভাবিব উগ্ররসে ভরা ঝাঁঝালো ঝগড়ার কণ্ঠস্বর অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছিল। সাহানুর কথা বোধহয় ও ভুলে গিয়েছিল। আশরাফ কী ভেবে লাইটের সুইচটা অন্ করে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার তা নিবিয়ে দিল।

তুমি আলো জ্বাললে কেন ? সাহানু অন্ধকার কোণ থেকে চিৎকার করে উঠল উত্তেজিত কম্পিত সুরে।

আশরাফ ততক্ষণে নিজকে সামলে নিয়েছে। নীলচে জোছ্নায় একটুখানিক ব্যাঙ্গাত্মক পাংশু হাসি ছিটিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, আলো না জ্বাললেও চলত কারণ তোমার আমার মতো বয়সের মেয়ে ছেলেরা কখন কী করতে পারে সে সব প্রতিটা মুহূর্তের ইতিহাস, ফ্রয়েড মশায় খুব পরিষ্কার করে লিখে গেছে। আলো জ্বালিয়ে তার প্রমাণ আমার না দেখলেও চলত।

কেবল ফ্রয়েড আর ফ্লবেয়ার। যতসব ছাপার অক্ষরে চে'খা চোখা সাজানো বুলি! কেন দরদ দিয়ে নিজের মন থেকে সহজ সরল করে একটা কথাও কি তুমি বলতে পার না, আশি ভাই ? এক নিঃশ্বাসে এই অবধি বলে সাহানু আর সেখানে দাঁড়াল না, খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

আশরাফ প্রথমটায় একটু অগোছালো হয়ে পড়ল। ও ভেবে ভেবে অবাক: এ কেমন অদ্ভুত মন্বন্তর! আমার আলোয়ানটাকে নিবিড়ভাবে বাহুর ওপর, গলার ওপর, বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে তুমি অন্ধকারে বসে বসে নিজের দেহকে উষ্ণ রাখছিলে— শীতের ভয়ে। বেশ তো, তাতে হয়েছে কী ? আর আমি যখন আলো জ্বাললাম তখন কিনা সব দোষ হলো আমার ?

হঠাৎ চমকে উঠল আশরাফ, আঁধারে দ্যুতিময় একটা কিছু জ্বলছে টেবিলের ওপর। চারধারে তার বিচিত্র বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা।

আমার দুল জোড়া বোধহয় টেবিলের ওপর ফেলে গেছলাম নারে ? দুলের খোঁজে ঘরে ঢুক্‌ল ভাবি, কোনো কথা না বলে তুলে নিল দুল জোড়া। তারপর তার পানে চেয়ে নিঃশব্দে কানে দুল পরাতে পরাতে পা বাড়াল ঘরের বাইরে।

আশরাফ ভাবে, রহস্যময় হবার ভাবির কোনো প্রয়োজন ছিল কি ? আশরাফের চোখ দুটো যন্ত্রণায় জ্বালা করে উঠল। ভাবির দুটো নিটোলবাহু বাঁ কানের হীরেটা ধরে, তা থেকে বহুবর্ণের টুকরো টুকরো প্রতিফলিত রঙিন আলোর রেখা, পালকের মতো কোমল ঘাড়ে নীলচে চাঁদের আলো— সবটা মিলে আশরাফকেই যেন ব্যঙ্গ করে কিছু বলছে, হাসছে, বিদ্রূপ করছে।

গরম চাদরটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে আশরাফ শুয়ে পড়ল। রাত খুব কম হয়নি। এগারটা বোধহয় বেজে গেছে। শবে-বরাত, অন্দরমহলের কোলাহল তখনো অবশ্য তেমন কিছু

কর্মেনি। আশরাফ ভাবছিল সাহানুর কথা। এ সাহানুর অন্যায়। সাহীর এ দুর্বলতা অক্ষমার্হ। সত্যিই যদি সে তার আশি ভাইকে ভালোবাসবে, তবে তা প্রকাশ করাব মতো সাহস কেন নেই ওর? আলোতে আসতে ভয় পায় কেন? চাদরটা গায়ের ওপর ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে এবার আশরাফ সত্যিই ঘুমুবার চেষ্টা করল।

গভীর রাত তখন। দু'টো থেকে তিনটে অবধি হতে পারে। মাথার কাছে অনেকক্ষণ অবধি কার অধীর পায়ের শব্দ শুনে আশরাফের ঘুম ভেঙে গেল। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, কে?

আ-মি, সাহানু।

তুমি, এত রাতে ঘুমোওনি যে?

আজ রাতে সবাই জেগে আছে, তাই আমিও জেগেছিলাম।

ওহ্।

আশরাফ আবার চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

আশি-ভা-ই-ই!

কে যেন মৃদু স্পর্শ করে ডাক দিল। মুখের ওপর থেকে চাদরটা একটু সরিয়ে বলল, কে সাহী নাকি? বস ঐ সামনের চেয়ারটায়, বলবে নাকি আমায় কিছু?

একটা কথা শুধু আশি ভাই, তোমার ঘুমের সত্যি বেশি ব্যাঘাত কবব না। বল, তুমি আমার সেদিনের কথায় রাগ করনি তো?

ঘুমের ঘোরে আশরাফ ঠিক বুঝতে পারছিল না। সাহানু কবেকাব কিসের কথা বলছে। তা ছাড়া বেশ লাগছিল ঘুমকাতুরে ঝাপসা চোখে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় সাহানুকে দেখতে। কথার রেশ ধরতে না পারলেও বেশ লাগছিল এ ধরনের আবছা সংলাপ। তবুও একটু সপ্রতিভভাব সুর টানল—পাগল, তোমার আমার রাগ সে তো বরাবর এক তরফাই চলছে।

মনে মনে আশরাফ তখন হিসেব করছিল কার কথায় বেশি অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল— কে বেশি তন্দ্রাচ্ছন্ন? সে না সাহানু?

তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে মিঠে সুরে সাহানু আরো কী কী বলছিল, আশরাফ তার সবটা শোনেওনি হয়তো। শুনলেও বুঝবার চেষ্টা করেছিল কিনা সন্দেহজনক। একজন উচ্ছ্বসিত আবেগে অনর্গল গুঞ্জরণ করে চলেছে, অন্যজন স্তিমিত তন্দ্রীতে নির্বিকার চিত্তে কিছু শোনেওনি। শুধু আধ বোঁজা মদির চোখে অক্ষরগুলোকে যেন উদাসীন আগ্রহে শূন্য থেকে ধরবার চেষ্টা করছে।

এক সময়ে আশরাফের আবছা চোখের সামনে ছোট একটা নরম পুঁটুলি নড়ে উঠল। চোখগুলো একটু টেনে আশরাফ বুঝল সাহানু কিছু বলছে খুব উত্তেজিত সুরে, আর তুলতুলে পুঁটুলিটা ওরই একটু মুঠকরা হাত। আশরাফের গলার স্বরে ক্ষীণ জিজ্ঞাসার চিহ্ন, কী?

বলতে পার, আমার এ হাতের মুঠোর মধ্যে কী আছে?

বাহ্ তা আমি কী করে বলব।

পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, এখন বলো তো?

হীরের দুল?

দুর ছাই— আবার বলো।

পুঁতির মালা।

হয়নি, কিছু হয়নি।

তাহলে আমি আগে খুলেই দেখি তারপর না হয় বলব কী ছিল তোমার হাতে।

আশরাফ মন্থর গতিতে ওর ঘুমন্ত হাতটাকে হেঁচড়ে তুলে ধরে, সাহানুর মুঠো খুলবার জন্য। সাহানু ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। চট্ করে দ্রুত বেগে হাতটা সরিয়ে নেয়। রহস্যশংকালু কণ্ঠে শুধু বলতে থাকে—না-না। তোমায় আমি দেখাব না। আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে গোপনীয়— আমার দেহের সঙ্গে বন্দি করে রেখেছি সে-সম্পদকে এই মুঠোয়। তা আমি তোমায় দেখাব না। তুমি তা দেখতে পারবে না, কক্ষণো পার না—না—!

এরপর আর একটা অক্ষরও আশরাফ বুঝতে পারে না। চোখ দুটো ওর সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আসে ঘুমে।

বোধহয় এর ঘণ্টাখানেক পর। আশরাফের ঘুম ভেঙে গেল, এক অস্বস্তিকর কল্পনার সংঘাতে। ওর মনে হতে থাকে যেন একটু আগে সাহানু এসেছিল ওর বিছানার কাছে; কথা বলেছিল ওর সাথে। তবুও কী যেন বলেছিল ওর কিছুতেই মনে পড়ে না। তাহলে সাহানু সত্যি এসেছিল! ঐ বিছানার ধারে চেয়ারটাও ঠিক জায়গাতেই আছে। কী একটা লুকিয়েছিল সাহানু তাকে দেখতে দেয়নি। আশরাফ উঠে দাঁড়াল। এক হাতে ছোট্ট টর্চটা নিয়ে ও দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরটার দিকে চলতে থাকে। ঐখানেই থাকে এ কয়দিন ধরে সাহানু আর ভাবি। আশরাফ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে ঘরে ঢুকল। সাহানুকে সে ডেকে তুলবে, জিজ্ঞেস করবে, জোর করে দেখবে, যা সে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে, আশরাফের চোখের সামনে থেকে। সে চোখ তখন ছিল ক্লান্ত, এখন তা জাগ্রত। আশরাফ তাই দেখতে চায়। আশরাফ সাহানুকে ভালোবাসে সে দাবির সুষ্ঠুতাকে সংকটে ফেলতে হলেও আশরাফ জানতে চায় সাহানুর চরম পরম গোপন সম্পদকে।

মশারির কিনার দিয়ে ঝুলে পড়েছে সাহানুর জাফরানি রঙের ওড়নির জড়ির পাড়টুকু। আঁধারে জ্বলছে ভাবির হীরের দুলটার মতো ঠিক্‌রে ওঠা আভায়ম। মশারিটা ধীরে সরিয়ে আশরাফ টর্চটা জ্বালল। ওড়নির ওপরই সাহানুর অসহায় হাতটা ঠিক তেমনিভাবে মুঠা করা অবস্থায় বিছিয়ে আছে ওড়নির ওপর। আল্‌তো হয়ে বুঁজে আছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে আশরাফ ওর মুঠোর আঙুলগুলো নির্ভয়ে ছাড়িয়ে নিল। তারপর মুহূর্তেই আলোটা সাহানুর সুন্দর ছোট হাতের নরম বুকে পড়তেই শিউরে উঠল আশরাফ।

সাহানুর হাতের ওপর মেহদি পাতার লাল অক্ষরে খুব পরিষ্কার করে লেখা— আশি।

কিন্তু তবু ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস, আত্মতৃপ্তির সে কলরোল সব ছাপিয়ে আশরাফের চোখের সামনে ক্রমশ ভেসে উঠতে লাগল একটা সিরিজ। টিউবের ওয়াসারটা ওপরে উঠছে আর ফাঁপা বাতাস সূচ-ছিদ্র পথে টেনে তুলছে লাল টাট্‌কা তপ্ত রক্ত।

ওর মনে হতে থাকে সাহানুর ছোট হাতের মাঝে ঐ যে লাল দু'টো অক্ষরের ইঙ্গিত, তা শুধু অন্তরালের স্ফীত রক্ত কণিকার অতৃপ্ত বিস্তৃতি। ঐ পাতলা চামড়া ছিঁড়ে ওরা যেন বেরিয়ে আসতে চায়। ওরা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আশি, আশি— আশি !

একটি তালাকের কাহিনী

হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপ্টা পাট বোঝাই নৌকার গোলুইটা হঠাৎ ঘচ্ করে জার্মানি ফেনার স্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শীর্ণ খালের মধ্য দিয়ে গত দু'ঘণ্টা যাবৎ একটানা লগি ঠেলতে ঠেলতে নজু মিঞার মাথার মধ্যেও যে প্রশ্নটা খুঁটি ওপড়ান পোঁয়ার বলদের মতো সব কিছু তোলপাড় তছ্‌নছ্ করে ছুটাছুটি করছিল সেটাও আচমকা থমকে স্থির নিশ্চল শান্ত হয়ে গেল। নৌকাটার মাথার দিকে আরও আঁটসাট হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে। বাড়ির ঘাট থেকে রওহবার সময় মোল্লাবাড়ির হাঁপানীতে ভোগা কাসেমভাই খক্‌খক গলায় সে বিদ্রূপটা এক দলা কফের মতো ওর কানের গর্তে ছুঁড়ে মেরেছিল। মনে মনে নজু আরেকবার সেটা নেড়েচেড়ে দেখে। নিরুত্তেজ নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ত বুদ্ধি নিয়ে। কাসেমভাইর ঐ সন্ধ্যেবেলার একটা খোঁচা থেকেইত তার মনের প্রশ্নটা জন্ম নেয় নি। একটু একটু করে সন্দেহটা জমে উঠতে শুরু করেছে গত দুসপ্তাহ থেকে। বাজারের শেকুমিঞার মুচ্‌কি হাসি, কামাল ডাক্তারের অযাচিত উপদেশ করিম মুন্সির আত্মতৃপ্তির হাসিমাখা সাবধানবাণী আরো হাজারো নানা রকমের ঘুসঘুসে কিসকিস্ করা গুজব একটার পর একটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল ওর মনে। একটার সংগে আরেকটা যেন কাসেমভাইর হাঁপানী বুকের শক্ত সবুজ আঁঠাল কফ দিয়ে গায়ে-গায়ে লাগানো। ঝাঁকুনি দিলে আলাদা হয় না। ঝেড়ে ফেলতে চাইলে পড়ে যায় না।

পাটের দুই উঁচু পাহাড়ের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে জ্যাঠাও ভাই কালু মিয়া ঝিমুচ্ছিল। লগি ঠেলবার পালা তার ছিল শেষরাতে। নৌকার পেটের মধ্যে যেটুকুন জায়গা-ধারগা ছিল পাটের স্তূপের একদিকের গাঁটে হেলান দিয়ে তাতেই সে বেশ আরাম করে শুয়েছিল। নৌকা থেমে যাওয়াতে কাৎ হয়ে একবার মুখ বাড়াল সামনের দিকে। নৌকা থেকে নেমে হাত দিয়ে টেনে-টেনে কিছু জার্মানিন ফেনা উপড়ে না ফেললে নৌকা যে আর নড়ছে না তা সে বুঝতে পারল। যা শক্ত আর মোটা আর ভারি এই বদ পানার জাত। তবু ভাইজানকে একবার গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নামন লাইগব নি নজুভাই ? চৈর ধরি উজা যাইতি' ন ?'

নজু মিঞা ততক্ষণে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। অশান্ত দ্বন্দ্ব প্রশ্নাবলীকে দিলে চূর্ণ করে তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটা তীক্ষ্ণ কঠিন সংকল্প। তাইত ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ পেছনের ডাক শুনি চমকে উঠল না একটুও। অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক গালি জুড়ে উত্তর দিল, 'হুতি হুতি নবাবি করিচছা আর। নামি যাই। হোন্দের কিনার টানি ধর আঁই এমুইর গলুই ধইরছি!'

বলতে বলতে নজু মিঞা পানিতে পা ঠেকাল। পেছনের দিকে নেমে নৌকা ধরে কালু। ফেনার জংগল থেকে নৌকা মুক্ত করে কালু নৌকায় উঠে দেখল নজুভাইর তার খালপাড়ে দাঁড়িয়ে পা ধুচ্ছে। নৌকায় চড়বার উদ্দেশ্যই যেন নেই। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ভাইর দিকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে নজু মিঞা খুব শান্ত কণ্ঠে ওকে নির্দেশ দিল :

মাল নিয়ে ওকে একলাই যেতে হবে হাজিগঞ্জের বাজার পর্যন্ত। নজু মিঞার নাকি কি একটা জরুরি কাজ বাড়িতে, আগামীকাল। এতক্ষণ একদম খেয়াল ছিল না, এখন মনে পড়েছে।

এই বাজার থেকে ফিরতে তার বড় জোর বাড়ি পৌছাতে ঘণ্টা দুই লাগবে। মাঝ রাতের আগেই বাড়ি পৌছাতে পারবে। কাজেই সে চলল।

জোস্নার আলোতে ঝলমলো কাঁচা মাটির বাঁধান রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে নজু মিঞা তার জরুরি কাজের মহড়া দিচ্ছে মনে মনে। আজ রাতেই গুজব আর মুচকি হাসি আর বিদ্রূপের গলা টিপে মারবে সে। ফাতেমার রূপের গর্বে আজ রাতেই সে মাখাবে রক্তের ছোপ। নতুন স্বামীর সোহাগে মাজা গলা ঢাকা যৌবন আজ রাতে তাকে ভোলাতে পারবে না। আজ রাতে ফাতেমা জানে সে ফিরবে না, হাজিগঞ্জের বাজার সেরে আসতে অন্তত পরের দিনের ভোর উতরে যাবেই। ঐ রসে রাঙা আগুনে শরীর বিয়ের পরেই না পেতেই কত পুরুষের সোহাগের জন্য লক্‌লক্ করে ওঠে আজ সে নিজ চোখে পরখ করে দেখবে।

দুই

দড়াম! দড়াম!

দু'হাত দিয়ে, দু'পা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে লাথি মেরে ঘুসি মেরে চলেছে নজু মিঞা। ভেতরের হুড়কো ঠেলে ভেঙে পড়তে চাইছে। কাঠের দরজা, ঠক্‌কায় ঠক্‌কায় নড়ে উঠছে টিনের চালা পর্যন্ত। অত রাতে স্বামী ফিরবে না জেনে বৌ যদি ঘুমিয়ে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দরজা খুলতে দেরী হতে পারে সে খেয়ালটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে নজু মিঞা। মরিয়া হয়ে আরেকবার জোড়াপায়ে জোড়াহাতে আঘাত করতেই ভেতরের হুড়কোটা দুটুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো দূরে। ভয়ংকর শব্দ করে কপাটের দুধার আঘাত করল মাটির দেয়ালের দু'ধারকে। সে শব্দ ডুবিয়ে দিল ফাতেমার ভয়ার্ত আর্তনাদ। লাফিয়ে ঘরে ঢুকল নজুমিঞা। বড় বড় চোখে ফাতেমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার স্বামীর দিকে, ভয়ে বিস্ময়ে সে চাহনি হয়ে উঠেছে দ্যুতিহীন, পাথুরে। অগোছাল শাড়ির প্রান্ত ধরে ধরে চাঁদের আলো ওর অসংবৃত দেহকে অশ্রুহীন নির্লজ্জ যৌবনে উন্মুখ করে তুলেছে সেদিকে পর্যন্ত ফাতেমার খেয়াল নেই, চাঁদের আলোতে ওর স্বামীর ক্রূর মুখে চোখ জ্বলজ্বল করছে সাপের চাহনির মতো— দেখে ফাতেমা শিউরে উঠল। তবু চেতনা হলো না গায়ে কাপড় ভাল করে টেনে দেবার, মাথার আচল তুলবার। নিষ্পলক চোখে শুধু দাঁড়িয়ে রইল ঘরের কোণে। বাড়ির ভেতরের দিকে পুকুরঘাটে যাবার দরজাটা খোলার সংগে সংগে তীরের মতো দৌড়ে কে যেন ঐ পথ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল!

চিৎকার করে উঠলো নজু : 'কে! কারে বাইর করি দিলি ইয়ানদি, জলদি করি ক, হারামজাদি ক' জলদি করি, নইলে গলাটিপি ঠাইৎ মারি হালাইউম!'

এবং তার পরেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাগলের মতো খোলা দরজা দিয়ে উঠানে নেমে পড়ে পলাতক মানুষটির খোঁজে। ফাতেমা সম্বিত ফিরে পায়। বুঝতে পারে স্বামীর আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের কারণ আর ঐ অবিশ্বাস্য উন্মত্ততার তাৎপর্য। স্বামীর বিরুদ্ধে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে এল পাতলা লাল ঠোঁট, চিকন কালো ভ্রূ। গায়ের ওপর শাড়ি ভাল করে গুছিয়ে প্রস্তুত হলো স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য। বাইরে কারো হদিস না দেখে নজু ঘরে ফিরে এসেছে। উত্তেজনায় থরথর করে তার গা কাঁপছে, দরদর করে ঘাম পড়ছে। চরম কর্তব্য স্থির করার আগে সে মরিয়া হয়ে একবার প্রশ্ন করল। 'বিছনাত হুতি আছিল কে ?'

'আই।' শান্ত সুরে জবাব দেয় ফাতেমা।

দম বন্ধ করে নজু আবার প্রশ্ন করে। 'তুই হতে হতে হুতি আছিলি ইয়ানো ? আরও তুই... এই দরজা খুলি বাইর অই গেল কে ?'

'আঁই একবার উঠছিলাম হোওনের ওক্তে, লাগানোর কথা মোনো আছিল না আর—'

'আরে আর ভারাইচ্ছারে হারামজাদি ? তোর গা উদাম করল কে হেইলে, তোর গার কাপড়ের প্যাঁচ হস্ করাইল কে ? তোর উদাম হ্যাতে উদাম গা আঁই ঘরে ঢুই দেই না ?'

চিৎকারে ব্যাঙ্গ কর্কশ হয়ে এল ফাতেমার গলাও— 'আঁই কি নটি নি! আঁই কি নটি নি ? সোয়ামীর ঘরে হুইতুম গা উদাম করে হুইত্তাম না কি ছালার ছট দি নিজেকে মুড়ি রাইখুম নি ?'

উভয়ের গলার স্বরে তখন প্রতিবেশীরা দু'একজন উঠে পড়েছে। জটলা বেঁধে কেউ কেউ ঘুম নষ্ট করে ঝগড়া শুনছে, উপভোগ করছে। সে ঝগড়ার তখন কোনও মুখোশ নেই। শালী নগর ও চেষ্টা নেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইংগিত রহস্যে আঘাত করার। গলার স্বর সপ্তমে শব্দ প্রয়োগ আদিম হিংস্র বন্যতা।

তর্কের সীমা শেষ হয়ে এল এইখানে। সন্দেহের পুরো ভঞ্জন ঘটুক বা না ঘটুক সময় হয়ে গেছে সিদ্ধান্তের, সংকল্পের, কর্মের। হলোও তাই। নজু মিঞা বজ্র কণ্ঠে ঘাড়ের শিরা ফুলিয়ে ঘোষণা করল বিবির বিরুদ্ধে তালাকের ফরমান। একবার, দু'বার, তিনবার।

ফলাফলটা জানাবার পর পাড়াপড়শীরা গুটিগুটি করে সরে পড়ল যে যাব ঘবে। নিশ্চিত হলো চরম পরিণতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করার জন্যে। ইমাম সাহেবের নির্দেশমতো তাদের চোখের সামনে দিয়ে পাড়ার মসজিদের একজন চলে গেল রূপসা গ্রামের দিকে। মেয়ের বাপকে খবর দিতে হবে। ফাতেমা বিবির তালাক হয়েছে, একেবারে তিন তালাক, পরিষ্কার। শুনেছে এমন তিনজন সাক্ষীর নামও সেখানে যোগাড় করা হলো। এরপর ফাতেমা বিবিও আর স্বামীর ঘরে একরাতও থাকতে পারবে না। কাল ভোরে ফরিদ মোল্লা আসবে। তালাক দেয়া মেয়েকে নিয়ে যাবে নিজের পাড়াতে। শ্বশুরবাড়ি থেকে ছাড়িয়ে।

তিন

ব্যাপারটা যত নীরবে নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে চুকে যাবে বলে সবাই গতরাতে আশা করেছিল। পরের দিন ভোর বেলায় দেখল ঘটনাটা একটা রীতিমতো উত্তেজনাপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফাতেমার আব্বা ফরিদ ব্যাপারী মেয়েকে নেবার জন্য বেশ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তার সঙ্গে এসেছিল তার প্রাণের মুখী তাহের মোল্লা। এই মৌলভি সাহেবই নাকি সবটা শুনে, তদন্ত তদারক করে ফতোয়া দিয়েছে যে তালাক নাকি কবুল করার যোগ্য নয়। যে তিনজনকে সাক্ষী হিসেবে সকর্ণে তালাক ঘোষণা শুনেছে বলে দাবি করে তাদের একজন নামাজ জানে না, একজন জেনেও একদম পড়ে না, আর একজনের আদম থাকলেও প্রায় রোজই দু-এক ওয়াক্ত একাজ ওকাজের জন্য বাদ দেয়। এরা সব মোনাফেক। মোনাফেকের সাক্ষীর ইসলামের চোখে কোনো মুল্য নেই। কাজেই তাদের সাক্ষী কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফাতেমা বিবির বাপের গ্রামের তাহের মোল্লা তাই ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে নজু মিঞার বিবি তালাক হয়নি। ফরিদ মিঞাও স্থির করলেন মেয়েকে তার সোয়ামীর ঘর থেকে কিছুতেই তিনি বার করে নিয়ে যাবেন না। কেউ জবরদস্তি বার করে দিতে চাইলে সেই মোনাফেকের শরিয়তের বিরোধী কার্যকলাপকে তিনি জান দিয়ে হলেও বাঁধা দিবেন।

ভিন গাঁয়ের মোল্লার এই উদ্ধত ফতোয়ার এই গায়ের ইসলাম হলো আহত। ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্তকে এ রকমভাবে উড়িয়ে দেয়াতে নজু মিঞার প্রতিবেশীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা অপেক্ষা করতে লাগল তাদের ইমাম সাহেবের নির্দেশের জন্য। এ অপমানের প্রতিকার তারা করবেই। ইমাম সাহেব আশেপাশের দু'দশ পাড়ার বিয়ের আর জমির মামলার সকল রকম দলির নথিপত্রাদির নাড়ি-নক্ষত্র ভাল করেই জানেন। প্রত্যক্ষভাবে নিজে সেগুলোর কর্মকর্তা না হলেও অন্তত দাওয়াতের কল্যাণে সব রকম কর্মক্ষেত্রেই তিনি উপস্থিত থাকেন। হঠাৎ ইমাম সাহেবও সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে রূপসা গ্রামের তাহের মোল্লার যুক্তি তিনি মেনে নিচ্ছেন তবে তাদের মোল্লাকেই মানতে হবে সে যুক্তির প্রতিটি ইশারা। নজু মিঞার বিয়েতে যে তিন ব্যক্তি সাক্ষী ছিল তাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে করেই তিনি সমগ্র গ্রামবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এদের একজন শরাব পান করে, একজনে জুয়া খেলে, অন্যজনে একটি দাগী চোর। মোনাফেক সাক্ষী রেখে যে বিয়ে মানা হয়েছে তাই কিছুতে কবুল করা চলে না। নজু মিঞার বিয়ে শরিয়ত মোতাবেক কোনও দিনই হয়নি। ফাতেমা বিবিকে দেহ সঙ্গিনী করে যে জেনার সম্পর্ক গত ছমাস ধরে গড়ে উঠেছিল সেটা সম্পূর্ণ অবৈধ। ধর্মের চোখে গুনাহ। যতক্ষণ এ বাড়িতে ফাতেমা থাকবে ততক্ষণ প্রতি লহমায় সে গুনাহর পরিমাণই শুধু বাড়বে। ফাতেমার বাবার তাই একমাত্র কর্তব্য মেয়ে যত শিগগির সম্ভব এ বাড়ি থেকে সরিয়ে নেয়। নইলে নজু মিঞাকে ধর্মের খাতিরে বাধ্য হয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ধর্মের সংগে ত আপোস চলে না।

ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যায় নেমেছে। ফরিদ মোল্লার গ্রামের লোকেরও অনেক ভীড় হয়েছে নজু মিঞার বাড়ির উঠানে। লাঠি, সড়কির আমদানিও হয়েছে প্রচুর। তাদের গায়ের মেয়েকে যে ভিটে থেকে বার করে দেয় তারা দেখে নেবে। আল্লার কালামের বিরোধিতা করতে যারা আসবে তাদের গর্দান আস্ত রাখবে না এরা।

নজু মিঞার পাড়া-পড়শীরাও প্রস্তুত। ইমাম সাহেবের মেয়েকে ঘরে রেখে নিজেদের গ্রামকে তারা কলুষিত করতে কিছুতেই রাজি নয়।

কিছুক্ষণ তর্ক হলো। তারপর খোলাখুলি গালিগালাজ। চরম অবস্থায় হাতাহাতিও শুরু হয়ে গেল। দাও, বটি, লাঠি চলল এলোপাথাড়ি, ইসলামকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে, গ্রামকে কলঙ্কিনী নারীর সংগ থেকে গিয়ে শুরু হলো একটা মুক্ত অথচ রক্তাক্ত হাঁক। শান্ত হয়ে রণাঙ্গন থেকে সবাই ছুটল থানায় খুন জখমের কথা ডায়রি করে আসতে। এ ওর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার নালিশ সরকারীভাবে পাকাপাকি করে রাখবার জন্য।

নজু মিঞার গ্রামে এই দাংগায় গুরুতরভাবে একজন, মোট আহত হয়েছে এগারজন। ও পাড়ার আশংকাজনকদের সংখ্যা তিন, এমনি জখমের সংখ্যা একুশ জনের মতো। নজু মিঞার বিরুদ্ধে ফরিদ মোল্লার, আবার শ্বশুরের বিরুদ্ধে জামায়ের দু'তরফ থেকেই আদালতে নালিশ দাখিল করা হলো। উভয়ের অভিযোগই নরহত্যা ও তার উস্কানিকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে একে অন্যের বিরুদ্ধে।

চার

সমস্ত ঘটনাটা সম্পূর্ণ শুনে আদালতের নতুন মুসলমান হাকিম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিচরাসনে এসে হাকিম বিস্মিত হতবাক! কার জন্যে কী শাস্তির বিধান হবে তার হদিস না পেয়ে হাকিম

যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সবাইকে হকচকিয়ে যে রায় করলেন সেটা আরও আশ্চর্যকর।

সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল দু'পাড়ার দুই ফতোয়া জারি মৌলভি সাহেবের বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো রাজদণ্ড। করিম মোল্লা আর ইমাম সাহেবের দীর্ঘ ছমাসের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড বরণ করতে হবে।

পাঁচ

হাকিম শত হলেও এ যুগের বিচারক। মোগল যুগের কাজির বিচার হলে দণ্ডবিধানের রূপটা নিশ্চয়ই আরও সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট হত। কই হাকিম তো দুই মৌলভির কারাগারে অবস্থান সম্পর্কে তেমন পরিষ্কার কিছু নির্দেশ দিয়ে দিল না। হুকুমের চাকর পুলিশ যদি কিছু না বুঝে কারাগারের একই কক্ষে দুই মোল্লাকে এক সাথে আটক করে রাখে— তখন ?

মানুষের জন্য

আত্তাহিয়াতো শেষ করে কেবল ছালাম ফিরিয়েছেন, মোনাজাতের জন্য তখনও হাত তোলেননি। বাইরে রাত কেটে আলো ফুটেছে কিন্তু ফিনকি দিয়ে সে আলোর ফালি ছড়িয়ে পড়ে নি তখনও। ফজরের নামাজের প্রান্তে মোনাজাতের আদ্যক্ষণে প্রকৃতির সমস্ত সাদা পবিত্রতাকে চিরে ছিঁড়ে খান খান করে উত্তর বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে আকাশের দিকে উঠে গেল একটা বিকট অশ্রাব্য সম্ভাষণ। চৌধুরী বাড়ির মুন্সি আফজাল সাহেব জায়নামাজের উপরই একবার মুখ বিকৃত করে ফেললেন সে শব্দে। চেষ্টা করলেন, দু'কানকে কিছু না শুনিয়ে শূন্যে এমনি ঝুলিয়ে রাখতে। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন জোড়া হাতের প্রশস্ত গহ্বরে মনকে নিমজ্জিত করে আল্লাহর কাছে পৌঁছুতে। পৃথিবী থেকে পালিয়ে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত দিল দিয়ে চাইলেন জলদি জলদি মোনাজাত খতম করতে।

আফজাল সাহেব পরহেজগার মুসল্লি হলেও এমন কিছু সুফি আউলিয়া ছিলেন না, কাজেই মোনাজাত করবার সময়ও উত্তর বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর তিনি সর্বক্ষণ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন। ছদুমিঞার যেমন গলা তেমনি ভাষা। অর্থজ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গিও যে নিশ্চয়ই সব সময় ভাষা প্রয়োগকে টীকা হিসেবে অনুসরণ করে চলছিল তাও আফজাল সাহেব অজুকরা রেখাঙ্কিত হাতে স্পষ্ট দেখতে পান।

ছদুমিঞা গালি দিচ্ছে। লক্ষবস্তু বাড়ির কেউ। বেশি দূর হলেও সে নিশ্চয়ই পাঁচ-দশ হাতের মধ্যেই উপস্থিত আছে, কিন্তু গলার স্বর গ্রামের দূরতম গৃহকোণের গভীরতম নিদ্রায় মগ্ন মানুষকে হঠাৎ উচ্চকিত করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে বিষয়বস্তু সে কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছিল, তার ভাবার্থ হয় না। দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তিও সম্ভব নয়। যেমন তার বেগ, তেমনি তার আবেগ। সে গালিগালাজ দুপুর অবধি চললেও মনে হবে যেন ছদুমিঞার নিরবচ্ছিন্ন প্রথম বাক্যটাই ব্যাকরণসম্মতভাবে এখনও শেষ হয়নি। প্রতি উচ্চারণেই সে একটা করে নতুন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই মুহূর্তে নিজের আপন ভাইকে, মাকে, বৌকে, বোনকে সম্বোধন করছে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে। আবার পরমুহূর্তেই এদের প্রত্যেকের আগত এবং অনাগত প্রতিটি সন্তানের দেহসঙ্গত জন্মদাতা বলে নিজের দাবিও জানিয়ে রাখছে নির্বিকার চিত্তে।

তছবির ছড়া লম্বা কোর্তার পকেটে পুরে আফজাল মুন্সি এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকাশ ভরে এখন ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর, সে বিষ ঠেলে আরো ওপরের কোনও পুণ্যস্তরে ভক্তের পবিত্র আর্তনাদ হয়তো পৌঁছবে না। ছদুমিঞার প্রতিটি স্পষ্ট উক্তি কখন যেন অলক্ষ্যে পিছলে ঢুকে পড়েছে মুন্সি সাহেবের মনের মধ্যেও চকচকে সাপের পিঠের মতো ইচ্ছেমতো কিলবিল করে বেড়াচ্ছে এখন।

চারদিক আবার শান্ত না হলে খোদার কথায় মন দেওয়া মুন্সি সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়। নামাজের পাটি থেকে উঠে খড়মজোড়া পায়ে দিলেন। পুকুরের ডান পাড় দিয়ে ধীরে ধীরে

অগ্রসর হলেন উত্তর বাড়ির দিকে। অনেক রকম বিলাপ ও গর্জনের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ছদুমিঞার কণ্ঠ— একাগ্রচিত্তে শুনছেন। আর তার খণ্ড খণ্ড সূত্র ধরে প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছেন পুরো ঘটনাটা।

উত্তর বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকে মুন্সি সাহেব আরো হকচকিয়ে গেলেন। ছদুমিঞা একটা ভাঙা পুরানো নৌকার বৈঠা তুলে বারবার চেষ্টা করছে পাশের বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। হুঙ্কারে হুঙ্কারে ঘোষণা করছে, হত্যা করার অটল সঙ্কল্প। সঙ্গের মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এসেছিল তারাই ভিড় করে রয়েছে ছদুমিঞাকে ঘিরে। ৪/৫জন চেপে ধরে রেখেছে অসম্বৃত লুঙ্গিতে আধঢাকা, কামিজহীন, ছদুমিঞার স্ফীত মাংসপেশীর ঘর্মাক্ত কালো বলিষ্ঠ দেহটাকে। কেউ তাকে উপদেশ দিচ্ছে, কেউ হুমকি, কেউ অনুনয়ও করছে। কিন্তু ছদু অপরিবর্তিত, শরীরে, আওয়াজে, ভাষায় ভয়ঙ্কর রকম বে-সামাল।

মুন্সি সাহেব বুঝলেন, বন্ধঘরের মধ্যেই এমন একটি লোক আছে, যাকে ছদু খুন করতে চায়, কিন্তু কেন ? আশ্চর্য, আজ উঠানের একটি লোকও মুন্সি সাহেবের শান্ত, সৌম্য গম্ভীর মুখ দেখে একবারের জন্য সসম্ভ্রমে ছালাম জানাল না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও কেউ একটি পিঁড়ি এনে দিল না। অথচ এই মুন্সি সাহেবের মুখের কথা এ গাঁয়েই শরিয়তের শেষ ফতোয়ার মতো মান্য। উত্তেজনায় এত বে-খেয়াল হয়ে আছে সবাই। এমনি নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর এমন চাঞ্চল্যকর দৃশ্য দেখা চলে। মুন্সি সাহেবেরও ধৈর্যের সীমা আছে, কৌতূহলের শুরু হয়। একবার মুন্সি সাহেব ইশারা করে একে ডাকেন, আবার ওকে। আদ্যপান্ত সবটা ঘটনা জানার জন্য মুন্সি সাহেব ব্যগ্র, চঞ্চল, রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

কয়েকমাস আগে ছদু ক্ষেতে গেছে ধান নিড়াতে। রান্নাব কাজ সেরে তফুরী বিবি ঘরের দাওয়ায় বসে পাটি বুনছিল। স্বামীর কিশোরী ছোটবোন হঠাৎ কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ভাবির গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। একটা বেতের চাঁছা লতা ঠিক ঘর মত বসাতে যাবে এমন সময় ননদের আকস্মিক সোহাগ এসে বাধা দিল কাজে। কৃত্রিম রাগের ঢঙে ধমকে উঠলো— 'এইলা উলালে দেখি একছার বাছছ না আর। তোর কি আইজ হাঙ্গা লাইগছে নি। ছাড়, গলা ছাড়ি দে'।

'একখানে এ্যাক মজার ছিজ দ্যেই আইছি ভাবি, কইত্যাম ন্য আঁই'।

মজার জিনিস আবিষ্কার করে যে অত উৎফুল্ল হয়ে ভাবির কাছে তা প্রকাশ করতে ছুটে আসে, সে জিনিস সম্পর্কে কিছুই গোপন রাখা যে ফজিলতের উদ্দেশ্য নয়, একথা বোঝা পানির মতো সোজা। বরঞ্চ প্রথমে রহস্য সৃষ্টি করে, পরে প্রকাশের ইচ্ছের মধ্যে একটা কিছু স্বার্থ লুকোনো থাকা সম্ভব। তফুরীর কল্পনা মিছে নয়। ভাবিকে চুপ করে থাকতে দেখে ফজিলতই আবার গায়ে পড়ে বলে।

'এক খাওনের জিনিস, বড় মজার। হুইনলেই জিহ্বাৎ হানি আইব'। ভাবি তবু বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে না। দীর্ঘ নিটোল বাহুতে ঢেউ তুলে বেতলতা ঘরে ঘরে টানা দিতে থাকে। ফজিলত কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে এবার সব বলেই দেয়। এইমাত্র অন্দরের ঘাটলা দিয়ে পানি তোলবার সময় সুপারির খোলের পর্দার ফাঁক দিয়ে সে অমন অতুলনীয় লোভনীয় দ্রব্যটি আবিষ্কার করেছে। মোটা ফুটফুটে এক থোকা ঝুলমান বেতফল, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে যার প্রতিটি ফল ফুলেফুলে নধর হয়েছে ইচ্ছে করলেই নাকি সেই থোকাটা

খুব সহজে এখনই পাড়া যায়। ডাগর কাল চোখ নাচিয়ে ভাবিই এবার ননদকে আদর করতে শুরু করে দেয়। মেটে হাঁড়ির তলার কালি আর বাটা মরিচ নুনে ঝাকিয়ে নিলে যে অদ্ভুত তার আসবে ঐ বেতফলের টকেঝালে সেই কল্পনাতে উথলে উঠে ভাবি। ফজিলতের পরামর্শ কল্পনাকে নিকট বাস্তবে নিয়ে আসে—

'আঁই আঁকশি বান্ধি ঠিক করি রাইখছি। গেলে অনই উডন লাহগব। হইর কিনারে গোছলের ভিড় জইমলে হেই ওক্তে আর ব্যাত ঝোপের পর্দায় কুলাইাত না'। ভাবিও তৎপর হয়ে ওঠে। ফজিলতের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে ঘাটলার দিকে। কর্মে এত প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফজিলতের একটা আপত্তি আছে, 'আঁই ছাট-দেয়ালের হেই কিনারে দিনে দুফরে গেলে মায়ে হ্যাদাইবো' একটু থেমে সে-ই আবার প্রশ্ন করে, 'আইচ্ছা ভাবি, হেইদিনত হাললম দিন পাড়া চরি বেড়াইতাম, এই কদিনেই আই এমন কিইবা ডাঙ্গর হই গেলাম'। মার উদ্বেগ ও সাবধানবাণীর তাৎপর্য তফুরী বোঝে, ফজিলতের গালে দুটো টোকা মেরে ছন্দ মিলিয়ে, অঙ্গ দুলিয়ে বলে, 'তোর যে দুই দিন বাদে হাঙ্গা'।

বিয়ের কথায় কিশোরী ফজিলত লাল হয়ে চোখ বুজ ফেলে। এটা ত আর ঠাট্টা নয়, এ সত্য কথা। ও নিজেও জানে। হাঁড়ির কালি, বাটা মরিচ, নুন এবং আরো অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করবার নির্দেশ দিয়ে তফুরী ঘাটলার পথে পা বাড়ায়। ফজিলত তার আবিষ্কৃত রহস্যের চাবিকাঠিটা শেষবারের মতো ছুঁড়ে মারে, চিৎকার করে। 'বাইর বাড়ি দি যান ভাবি, হুইর কিনার দি। কাঁডল গাছের হোচ্ছম দি রেইনলেই সামনে বেত্যার থোব দেইবেন'। যেতে যেতে মাথা নাড়িয়ে ভাবি আঁকশিটা তুলে নেয়। শাশুড়ির উপস্থিতি হঠাৎ কোনো বিস্ময়কর দুর্যোগ ডেকে না আনে, এই ভয়ে ত্রস্তপদে তফুরী মিলিয়ে গেল ছাট দেয়ালের ওপাশে। যাবার ভঙ্গিটার কথা ফজিলত কিন্তু তখনও ভাবছে। ভাবির রূপ যেন থেমে থাকতে চায় না কখনও। বড় বড় পা, বড় বড় হাত, বড় চোখ, বড় চুল, একটুখানি নড়লেই রূপ যেন সারা সাদা অঙ্গে টলটল করে নাচতে থাকে। ফজিলত একবার মনে মনে ভাবে, কিসের জোরে ভাবি শ্বশুরবাড়িতেও দিগ্বিজয়ী রানীর মতো বেপরোয়া চলাফেরা করে। সেকি শুধুই রূপের জোরে, না আর কারও সোহাগ বর্ম হয়ে ঘিরে রয়েছে ভাবিকে? ছদুভাই ভাবিকে আর ভাবি ছদুভাইকে এত ভালবাসে যে, ফজিলত পর্যন্ত মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়, তার তৃপ্তিহীন, সীমাহীন, কুল-কিনারাহীন উচ্ছ্বাসের কথা কল্পনা করে।

দুটো মাটির হাঁড়ির সরাকে মুখোমুখি উপড় করে চেপে ধরে ভাবি-ননদে ঝাকুনি দিয়ে তৈরি করেছে বেতুই ফলের ভর্তা। ভাবি এত মশগুল হয়ে আছে যে, বেতের কাঁটায় ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ির আঁচলটা পর্যন্ত স্বামী বা শাশুড়ির চোখ থেকে আড়াল করার চিন্তাটুকুও নেই। ভাবি-ননদ কাড়াকাড়ি করে খায়। মন্তব্য প্রকাশ করে, কালির ঝুলে বেতফলের কাঁচা কষ কতটা কেটেছে আর কতটা রয়ে গেছে। ফজিলত অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, ভাবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জেতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গালের মধ্যে মস্ত একদলা ভর্তা আঙুলের পাতা থেকে পাতলা জিবের ডগা দিয়ে ভাবি তুলে নিচ্ছে। তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠোঁট দুটো স্বল্প জোরে সংযুক্ত করেই এক কোণের একটুখানি শিথিল পথ দিয়ে পুটপুট করে এক গাদা স্বাদহীন মসৃণ দানা জিব দিয়ে ঠেলে বের করে দিচ্ছে। ঝগড়া শুরু করে দেয় ফজিলত। লাভ হচ্ছে না দেখে জোরাজুরি, তাতেও হেরে যাচ্ছে দেখে এবং ভাবি নির্বিকার চিত্তে নির্মম বেগে খেয়েই যাচ্ছে বুঝে ফজিলত ফুপিয়ে শুরু করে তার অপরাজেয় সংগ্রামের

প্রথম পাঠ। নাছোড়বান্দা ভাবি ভর্তার সরাসহ ছুটে সরে পড়তে চাইল রণক্ষেত্র থেকে। মরিয়া হইয়া ফজিলত ভাবির ফুলে ওঠা উড়ন্ত আঁচল শূন্য থেকে সাপটে ধরলো। চোখের পলকে এক হেঁচকা টানে ফস করে ওর ক্ষুদে মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল আঁচল, উড়ে চলে গেল ভাবি। শুধু যাবার সময়ের সামান্য অ-সাবধানতার জন্য মাটির সরাটা পড়ে খানখান হয়ে গেল। শব্দ শুনে হাঁ হাঁ করে একদিক থেকে বেরিয়ে এল মা, দৈবক্রমে ঠিক সে সময়ে বার থেকেও লাঙ্গল কাঁধে আঙিনায় প্রবেশ করল কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ছদু। সুন্দরী স্ত্রীর পলায়ন গতিটুকু দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে লাগল। মনে মনে মরণ ক্ষুধার মধ্যেও নিজের খোশ নসিবের জন্য খোদার কাছে একবার শোকরগুজারি করল। লাঙ্গলটা উঠানের কিনারে রেখে, বৌর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ডাকল। ভাত বাড়ার জন্য জানিয়ে দিল ক্ষিদেয় সে মরে যাচ্ছে। মা তখন ফজিলতকে জেরা করছে, সরা ভাঙল কে ? বেতুই ফল পাড়তে খোলা পুকুরপাড়ে গিয়েছিল কে ? বৌর দুঃসাহস যে কুলটা রমণীর পুকুরপাড় ধরে প্রান্তরে পা বাড়াবার পূর্বাভাস মাত্র, সেটা বেশ জোরে জোরেই রূপসীর স্বামীকে শুনিয়ে দিল। একে পেটের মধ্যে ক্ষিদে নাভিমূলে মোচড় দিতে দিতে ব্যথা তুলে দিয়েছে, তায় মা'র ঐরকম সুউচ্চ কণ্ঠের হৃৎকাঁপানো মিথ্যে কটাক্ষ। হুদুমিঞার মেজাজটা গরম দুধে লেবুর মতো রাগে ঝাঁজে ভরে উঠল। আরো বেশি কিছু শুনতে হয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘাটলায় হাত-পা ধুতে চলে গেল। কিন্তু শব্দ বাতাসে ভর করে চলে, যত বেশি জোরে সাড়া দেবে, ততই বেশি দূরে ধেয়ে যাবে। মা তখন বৌর শাড়ি ছেঁড়ার পর্ব শুনেছেন মাত্র। ভস্মীভূত বিষ তাঁতানো জিব থেকে জ্বলন্ত আগুনের হলকার মতো বেরুচ্ছে। শাড়ি তো আর এমনি সব সময়ে ঘোমটা হয়ে বৌর মাথায় পড়ে ছিল না। কাঁটায় যখন শাড়ি একবার আটকে ছিল, তখন নিশ্চয়ই শাড়ির সে অংশটা হয় বৌ'র গায়ের উপর ছিল, নয় গাছের উপর ছিল। একই সময় একই শাড়ির আঁচল তো দু'জায়গায় থাকতে পারে না। আর গাছে আটকেই ত' শাড়ি ছিঁড়ে যায় নি, বৌ নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে টানাটানি করেছে বলেই ফেড়ে গিয়েছে। গাছে কারো শাড়ির প্রান্ত অভ্যাসভাবে আটকে গিয়ে থাকলে পুকুরপাড় থেকে— হয়তো রহিম মোল্লা হা করে মানুষটাকে দেখেছিল— নইলে বৌ তাড়াহুড়ো করে হেঁচকা টানে আঁচল ছিঁড়বেই বা কেন ?

ছদুমিঞা রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বৌ'কে আর একবার ডাকল কর্কশ ঝাঁঝাল কণ্ঠে। নিছক ক্ষুধাতুর মানুষ— স্বামী নয়, প্রেমিক নয়, যেমন করে তার রাধুনীকে ডাকে। মাথায় কাপড় টেনে রক্তিম মুখে মাথা নিচু করে এগিয়ে এল তফুরী। এক হাতে সরাটা পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া। কিন্তু ঘরে ঢুকেই তফুরী থ বনে যায়। চোখ-মুখ তার ফেকাশে হয়ে আসে। হাতের ভাল সরাটাও খসে পড়ে গিয়ে চৌচির হয়ে যায়। ছদু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সেও দেখল ভাত আর তরকারির হাঁড়িটা খোলা পেয়ে পোষা বিড়ালটা আর রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুর নির্বিবাদে মুখ ঢুকিয়ে মাছ আর ভাত ছপছপ করে খাচ্ছে। ছদুর মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুব প্রয়োজনীয় রগ বুঝিবা অতিরিক্ত রক্তচাপ সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে ফেটে পড়ল। তফুরী চোখের পানি ঠেলে রেখে কোনরকমে একবার বলতে চেষ্টা করল, অল্পক্ষণ মধ্যেই সে কিছু চাল ফুটিয়ে নেবে। এই এক ছিলিম তামাক শেষ না হতেই সে আবার ভাত বেড়ে আনছে। ঠায় অমনি চুপ করে ঠিক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তা ছদু নিজেও বলতে পারবে না। আচমকা সে চিৎকার করে উঠল বিভৎসভাবে। রাগে ক্ষধায় কাঁপতে কাঁপতে ছদ যা

উচ্চারণ করল, তার মর্ম স্পষ্ট। এখন কেন, কোনোদিনই আর এই চুলোয় তফুরীকে ভাত চড়াতে হবে না। সে তাকে মুক্তি দিচ্ছে। তফুরী স্বচ্ছন্দে ফুল কাঁটায় আঁচল আটকে মাথার কাপড় বুকের নিচে ফেলে এখনই পুকুরপাড় ধরে রহিম মোল্লার হাতে হাত রেখে প্রান্তরের পথে পা বাড়াতে পারে। তফুরী চিৎকার করে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু ততক্ষণে চরম বাণী ছদু উচ্চারণ করে ফেলেছে। তালাক। তাও সোজা সহজ কিছু নয়, একেবারে তিন তালাক।

উঠান থেকে মা আর মেয়ে আচম্বিৎ এমন সাংঘাতিক ঘোষণা শুনে শিউরে আঁৎকে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দৌড়ে ছুটে আসে। বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে ছুটে এল ছোটভাই ফজু। সঙ্গে আরো দুএকজন প্রতিবেশী। কিছুক্ষণ আগের তুমুল ঝগড়ার কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে হায় হায় করে ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল মা আর মেয়ে।

তফুরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। ছদু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এগিয়ে এসে ঐ সোনার শরীরকে স্পর্শ করার সাহসটুকু পর্যন্ত তার উবে গেছে। বাজপড়া মানুষের মতো সে শুধু খাড়া হয়ে আছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে চোখের পলকে কোত্থেকে কী করে এ কাণ্ড হয়ে গেল। মা-মেয়ে পাড়া-প্রতিবেশিনীর সহানুভূতিসূচক বিলাপ আর কান্নার করুণ ঐকতানের মধ্যে ধীর শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল বয়সে কম কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ, ছোটভাই ফজু। কেবল সেই উপলব্ধি করছিল যে ছদুর নিশ্চুপ তন্ময়তা অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর। কিছু না বলে সে বড়ভাইকে টেনে বার করে নিয়ে গেল, বহু কান্নার ফোঁপানিতে দমবন্ধ ঘরের গুমোট আবহাওয়া থেকে।

নিজের হঠকারিতায় যে বুকভাঙা ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তার জন্য অনুতাপে শোকে কাহিল ছদু সারা দুপুর কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। রহিম মোল্লাও সবটা শুনে ফতোয়া দিয়েছে শরিয়ত মোতাবেক। তিন তালাকের কঠিন বিধি-নিষেধ ছদুমিঞার মহব্বতের জন্য শিথিল করে দেয়া সম্ভব নয়। ঠিক হলো, পরের দিন লোক এসে তফুরীকে তার বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে।

গভীর রাতে নিদ্রাহীন ছদুমিঞার বিছানার প্রান্তে এসে ফজু বসল। ফজু থাকে পশ্চিমের ঘরে। এঘরের ভাইরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূলত আর্থিক ও সাংসারিক। নাড়ি আর পরিবারের বন্ধনটাকে গতবছর সে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছে। তখন মেজাজ তার সব সময় একটু রুক্ষ থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে ছিল বেজায় রসিক। হপ্তায় হপ্তায় গঞ্জের হাটে, ফুলেল তৈল মেখে, ঢেউ পাটের সিঁথি কেটে একটু গান বাজনা ও ফূর্তির আসরে না বসলে তার চলত না। একবার কিছু সুপারি চুরি করে বেচতে গিয়ে ভাইর কাছে ধরা পড়ে যায়। জোয়ান বড়ভাইয়ের হাতে সেদিন প্রচুর মার খেয়েছিল। তারপর থেকেই নাকি তাকে আর কেউ কোনোদিন কোনো রকম হাসি-তামাশার হল্লায় দেখেনি। এর কিছুদিন পর সে নিজেই উদ্যোগ করে জায়গা-জমি সব ভাগ করিয়েছে। কিন্তু পাড়ার দশজনে মিলে দু'ভাইয়ের জমির যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে ফজুমিঞার তা মোটেই পছন্দ হয়নি। তার ধারণা, গ্রামবাসীরা তাকে অপছন্দ করে বলে বড়ভাই তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করে তাকে ঠকিয়েছে। বেছে বেছে তার ভাগে ঠেলে দিয়েছে যত পড়ো, অজন্মা জোলো-জংলা জমিগুলো। লোকে বলে, সে নাকি আব্বার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে রোজ রাতে বিড়বিড় করে আজও ভাইর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, গজব দেয়। প্রতিশোধের জন্য ক্ষমতা মাগে। ছদু

অবশ্য এ সব প্রচারের কিছুই বিশ্বাস করে না। সে দেখেছে ফজু কেমন ধীরে ধীরে সুস্থ, শান্ত, কর্মঠ হয়ে উঠেছে। ছদু ঠিক করেছে, ওকে স্বেচ্ছায় আরো কিছুটা জমি ছেড়ে দেবে।

ফজুমিঞা ভাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'আইন্যে যদি আঁরে বিশ্বাস করেন ত একটা কতা কইতাম হারি'।

'কী'?

'ভাবিরে এক দিনের লাই বিয়া করি আঁই ছাড়ি দিমু। কারোত্তন কিছু না কইলেই শাইরবো। এক লগে হুইতলেও আল্লার দোহাই'।

দড়মড় করে লাফিয়ে উঠল ছদু। তার মায়ের পেটের ছোটভাই। হোলোই বা তালাক দেয়া বৌ, তাই বলে বড়ভাইয়ের অনুরোধে তিনমাস দশদিন পর তাকে একটা লোক দেখান বিয়ে করে একরাত মন ভুলানো ঘব তার সঙ্গে পেতে সবার চোখে ধুলো দিয়ে সে যদি পরের দিন তাকে তালাক দিতে পারে? রাতের বেলায় অর্গল দেয়া দুয়োরের ফাঁক দিয়ে রহিম ত আর উঁকি দিয়ে থাকছে না? আনন্দে উল্লাসে ছদু বুকে জড়িয়ে ধরে ছোটভাইকে। অস্ফুট কণ্ঠস্বর আবার বুঝিয়েও বলে যে, তালাক তার ত সত্যি সত্যি হয় নি। দিল দিয়ে সে তালাক দেয়নি। কাজেই ফজু যেন বিয়ের রাতেও তফুরীকে ভাবির সম্মান দেখায়। ভাবি, ভাবি, কে না জানে ভাবি মায়ের সমান।

ঠিক তিনমাস দশদিন পর গতরাতে তিনজন সাক্ষী আর একজন মোল্লা নিয়ে ব্যাপারটা তারা এত চুপচাপ সেরেছে যে মুন্সি সাহেব পর্যন্ত একদম টের পান নি। ফজুর সাথে তফুরীব বিয়ে হয়ে গেছে। ভোররাত থেকেই তিনজন সাক্ষীসহ ছদু প্রান্তের আঙিনায় অপেক্ষা করছিল ফজুর জন্য। সকাল বেলাই ফজু তালাক দেবে তার নয়া বিবিকে, পুরানো ভাবিকে। কিন্তু ফজু হঠাৎ ভোরবেলা দরজা খুলেই নাকি ভাইকে দেখে বুহদিন পর তাব বাজারের সেই পরিচিত পুরাতন অট্টহাসিতে চমকে দিয়েছে সব্বাইকে। তারপর চিৎকার করে বলেছে— 'তালাক আই দিতান ন্য। দিতান ন্য। ব্যাক ভালা বালা জমির টুকরা আঁরে ভাড়াই আননে লই গ্যাছেন, ইয়াদ আছে হেই কথা? হে— হে— হে। আইজ আননের ব্যাকেরতন ভালা জমির টুকরা আঁই হাইছি। এইডা আঁই ছাড়ুম ক্যা? ছাইড়তান ন্য, আই ছাইড়তান ন্য'।

ছদুর শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির টুকরো সে যখন আজ একবার মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, তখন জান গেলেও ফজু তা ছাড়বে না। সঙ্গে এটুকুও জানিয়ে দেয়, 'হেই লগে এইডাও হুনি রাখেন ভাইজান, জমির লগে জমির ফসলও যায়, বুইজছেন? আঁর জমিৎ আমনে ফসল কইল্লান ক্যা হেইডাও আঁই দিতান ন্য। গলা টিফি মারি হালাইয়ুম।' ছদুর অনাগত সন্তানকে পর্যন্ত সে গলাটিপে মেরে ফেলতে চায়। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ছদু তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হাতের কাছে শক্ত যে জিনিসটা ছিল সেটা নিয়েই সে ছুটল ফজুকে খুন করতে। সড়াৎ করে ঘরের ভেতর ঢুকে ফজু দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কয়েকজন এসে চেপে ধরেছে ছদুমিঞাকে। চিৎকারে ছদুর গলা দিয়ে যেন রক্ত বেরুচ্ছে, চোখ যেন উলটে বের হয়ে আসতে চায়।

সবটা ঘটনা বুঝতে পেরে মুন্সি সাহেবের শুভ্র দাড়ি উত্তেজনায় স্ফীত নাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেঁপে ফুলে উঠল। সত্তর বছরের দুর্বল দেহটাকে হঠাৎ টান দিয়ে সিটিয়ে শক্ত সবল করে ফেললেন এক ঝাঁকুনিতে। তার আচম্বিতে পায়ের খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছদুমিঞার ওপর। সকলে হতবাক হয়ে শুনল মুন্সি সাহেবের গালাগালি— অশ্লীল, অকথ্য,

অশ্রাব্য। গ্রামবাসীর দৈনন্দিন উত্তেজনার আদিম বুনো পরিভাষা। বল্গাহীন, উদ্দামতার স্রোতবেগ।

'আরামজাদা, জারুয়া— শরিয়ত তোগো লাইন্য, তোগো, লাই শরিয়তন্য। হাইওয়ান জানোয়ারের লাই শরিয়ত হয় ন্য— শরিয়ত হইছে মাইনষের লাই।'

দম বন্ধ করে মুন্সি সাহেবের এই অভূতপূর্ব ব্যবহার দেখতে থাকে সবাই। ছদু নিজেকে খড়মের পিটুনির হাত থেকে বাঁচাতে ভুলে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মুন্সি সাহেবের অস্বাভাবিক চেহারার দিকে চেয়ে থাকে, মুন্সি সাহেব প্রচণ্ড চিৎকার ফেটে পড়েন— 'মজুর মান্দার আরামজাদ কোনানকার। আরামজাদ বিয়া কইছত ক্যা ? বিয়া করছ ক্যা ? এইডাও জানছ না যে হেইড্যা মাইয়া হোলার উপর তালাক লাগে না— হ্যাডে হোলা থাইকলে তালাক অয় না। হেই কথা না জাইনলে তালাক দ্যাছ ক্যা ? শরিয়ত মানছ ক্যা ? আইজো মানুষ হ। মানুষ হ। শরিয়ত মাইনষের লাই, হাইওয়ান জানোয়ারের লাইন্য'।

মুন্সি সাহেব আর পারেন না। হাঁপাতে থাকেন। ক্ষোভে, ক্রোধে চোখ ভেঙে তাঁর পানি গড়িয়ে আসে। সন্তানবতী নারীকে যে কখনই তালাক দেয়া যায় না এই নতুন তথ্য শুনে উত্তরবাড়ির প্রাঙ্গণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সব উত্তেজনাহীন, কোলাহলহীন, নীরব। সব্বাই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ছদুমিঞার দিকে। ঘট করে একটা শব্দ হতেই দরজা খুলে নতুন লালশাড়ি পরা তফুরী বেরিয়ে এল ঘর থেকে আঙ্গিনায়, এক পা-এক-পা করে এগুতে লাগলো ছদুর দিকে। নিতান্ত অনভিপ্রেত একটা রূপ ভোরের পাকাধানী আলোতে বারবার কম্পিত তার চুলে, চোখে আঁচলের প্রান্তে। আর ছদু আজ থেকে তিনমাস দশদিন আগে ঠিক যেমন অর্থহীন মরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছিল তফুরীর ভুলুণ্ঠিত অজ্ঞান দেহটাকে— সেই অকম্পিত চোখ জোড়াই সে আজও আবার মেলে ধরল মুন্সি সাহেবের মুখের ওপর মানুষের জন্য, হাইওয়ান জানোয়ারের জন্য— একথা তৃতীয়বার মনে হতেই মুন্সি ছদুর চোখের ওপর থেকে নামিয়ে নিলেন নিজের চোখ মাটির দিকে। হাত ছাড়িয়ে স্পর্শ করলেন ভোর থেকে পকেটে পরিত্যক্ত কঠিন পাথুরে তছবির ছড়াটাকে।